যেতে হবে বহু দূর

আহসান হাবিব বুলবুল

যেতে হবে বহু দূর

আহসান হাবিব বুলবুল

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা
www.phulkuri.org.bd

যেতে হবে বহু দূর

আহসান হাবিব বুলবুল

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

গ্রন্থ সত্ব

লেখক

প্রকাশকাল

একুশে বই মেলা ২০১৩

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য ঃ ১০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০। মোবাইল ঃ ০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Jetey Hobey Bohu Dur Written by **Ahsan Habib Bulbul,** Published by: S.M. Raisuddin, Director-Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price : 100/- Only. US$. 5/- **ISBN – 984-70241-0061-0**

www.phulkuri.org.bd

লেখকের কথা

ছোটদের নিয়ে আমার লেখা এই নিবন্ধগুলো জনপ্রিয় "ফুলকুঁড়ি" পত্রিকায় নিজকে গড়ো কলামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। লেখাগুলো সংরক্ষণ করতে গিয়ে রীতিমত একটি পান্ডুলিপি হয়ে যায়। প্রিয়জনরা এটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করার জন্য বলেন। বিশেষ করে বন্ধুবর কবি শরীফ আব্দুল গোফরান ও রেদওয়ানুল হক বিশেষভাবে উৎসাহ দেন।

আমি আমার লেখায় শিশু-কিশোরদের জীবন গঠনে, তাদের মানুষ হবার স্বপ্ন সফল করতে জ্ঞানের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি শিশুদের প্রেরণা শক্তি সাহস যুগিয়েছি মাত্র। কতটা সফল হয়েছি সে বিচারের ভার পাঠকের। তবে আমার এ লেখা শিশুর মহৎ জীবন গঠনে কিঞ্চিৎ সহায়ক হলেও নিজেকে ধন্য মনে করবো। লেখাগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটিড। এ মুহূর্তে আমি তাদের ও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আহসান হাবিব বুলবুল

উৎসর্গ
প্রিয় মানুষ
আহমদ মতিউর রহমান

www.phulkuri.org.bd

প্রকাশকের কথা

শিশু-কিশোরদের জন্য প্রবন্ধ লেখাটা বেশ কঠিন কাজ। সেই দুরূহ কাজটি করার প্রয়াস পেয়েছেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক আহসান হাবিব বুলবুল। শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে প্রেরণা শক্তি সাহস যুগিয়েছেন তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলোতে। প্রকৃতপক্ষে শিশুরাই তাদের মন মেধা ও কর্মের মাধ্যমে আগামী দিনের পৃথিবীকে গড়ে তুলবে নতুনভাবে। এজন্য তাদের শিশুকাল থেকেই উপযুক্ত আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে উঠতে হবে। তারা যাতে আগামী দিনের পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারে, সে জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের বিশেষভাবে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। এই বিবেচনার আলোকে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থ প্রকাশ করছে। লেখকের **"যেতে হবে বহু দূর"** পুস্তকটি শিশুদের মহৎ জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত এবং আমাদের প্রকাশনায় সাফল্য বয়ে আনতে সহযোগিতা করবে বলে আশা করি ॥

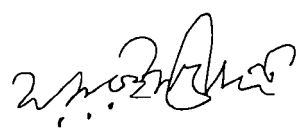

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
www.phulkuri.org.bd

সূচীপত্র

১.	যেতে হবে বহু দূর	৭
২.	কাজ ও আনন্দ	১০
৩.	নিজের কাজে লজ্জা নেই	১৩
৪.	জীবনের শুরুটা সুন্দর হোক	১৬
৫.	সত্য বলবো সত্য গ্রহণ করবো	১৯
৬.	পড়া-লেখায় আনন্দ খুঁজে পেতে হবে	২১
৭.	জীবনে চাই সুষমা শৃঙ্খলা	২৪
৮.	গতিময় সময়ের সাথে চল	২৮
৯.	সৃজনশীল মানুষ	৩০
১০.	লিখতে হলে পড়তে হবে	৩৩
১১.	গল্প নয় সত্যি	৩৬
১২.	প্রতিভা নিয়ে কথা	৩৮
১৩.	তুমিও পারবে	৪১
১৪.	বিজ্ঞানের হাতছানি	৪৩
১৫.	এসো দেশকে ভালোবাসি	৪৬
১৬.	আমার একটা স্বপ্ন আছে	৪৮
১৭.	শিক্ষার উদ্দেশ্য হোক আত্মশক্তির জাগরণ	৫০
১৮.	তোমাদের কাজের ভার নিতে হবে	৫২
১৯.	কবি'র প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে এসো	৫৪
২০.	সত্য ও সুন্দরের পথে এসো	৫৬
২১.	একটু মিষ্টি করে হাসো	৫৮
২২.	কথা দিয়ে কথা রাখবো	৬২
২৩.	সততা স্থায়ী সাফল্য এনে দেয়	৬৪
২৪.	মাকে ভালবাসো	৬৭
২৫.	গুণবান মানুষ হও	৭০
২৬.	ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো	৭২
২৭.	সুস্থ দেহে সুন্দর মন	৭৫
২৮.	এ উচ্চারণ হতে হবে তোমারও	৭৮

www.phulkuri.org.bd

যেতে হবে বহু দূর

আজকে তোমরা যারা শিশু তারা আগামী দিনের নাগরিক। বলা হয় A child is the father of the nation. দেশ ও জাতির আশা এবং স্বপ্ন হলো বর্তমানের শিশু। তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ। তোমরা একদিন ফুলের মতো বিকশিত হবে। গড়ে উঠবে আদর্শ নাগরিক হিসেবে। প্রতিটি শিশুর মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। কবি বলেছেন–

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।"

আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে এক সময় দিবাকর পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় পুলকিত হয় আকাশ। যেন একের আত্মাহুতি অপরকে নবজীবনে অভিষিক্ত করে। চিরন্তন সত্য এই যে, মানুষ মরণশীল। কিন্তু পৃথিবীর ক্রিয়াকর্ম থেমে থাকে না। নতুন এসে পুরাতনের স্থান দখল করে নেয়। এ নতুন বংশধরের ওপরই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আজ তোমরা যারা শিশু তারাই আগামী দিনে নেতৃত্ব দিবে। নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তোমাকে শিশুকাল থেকেই উপযুক্ত আদর্শবান ও ন্যায়নিষ্ঠ নাগরিকরূপে গড়ে উঠতে হবে। আকজের শিশুই বড়ো হয়ে দেশের হাল ধরবে। তোমরা শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক হবে। অথবা শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী বা রাজনীতিবিদ হবে। তোমরা যদি সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারো

www.phulkuri.org.bd

তবেই দেশের মঙ্গল নিশ্চিত হবে। আগামী দিনে যারা থাকবে না তাদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে তোমরা।

আমাদের মহানবী (সাঃ) শিশুদের ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিশুরা ফুলের মতন। একবার ফুলের কথা ভাবো। ফুল সুন্দর ও পবিত্রতার অনুসঙ্গ। সৌন্দর্য ও সুবাস ছড়ানোই ফুলের কাজ। কুসুম কখনো তার সুবাসকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না। সে প্রকৃতির বিরূপতাকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করে প্রস্ফুটিত হয় এবং নিজের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। ফুলের সৌন্দর্য দেখে মানুষের চোখ জুড়ায়। ফুলের মধুর লোভে ভ্রমর আসে। প্রজাপতি রং ছড়িয়ে উড়ে বেড়ায় ফুলে ফুলে। ফুলের সৌরভ ফুলের মধু কোনটাই সে নিজের জন্য ধরে রাখে না। অপরকে সুখী করার সাধনায় ফুল নিজেকে নিবেদিত করে। ফুলের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। ফুল যেমন নিজে বিকশিত হয়ে অপরকে খুশি করে। তেমনি তোমরাও নিজের জীবনকে বিকশিত করে, অফুরন্ত ভালোবাসা দিয়ে অপরের হৃদয় জয় করতে পারো। বাগানের ফুল যেমন মানুষকে আনন্দ দিয়ে থাকে, তেমনি মানুষের বিভিন্ন গুণও অপরকে আনন্দ দিতে পারে। ফুলের বাগান যেমন পরিচর্যা পেলে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, তেমনি মানবশিশুর মনেও স্বপ্ন ভালোবাসা ও সৌন্দর্যবোধের বীজ সুপ্ত থাকে, তা পরিপূর্ণ যত্ন পেলে ফুলেল হয়ে ওঠে। সমাজ-সংসারে সৌরভ ছড়ায়। তাই তোমরা নিজেদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলবে। তোমাদের সৌরভে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হবে। বর্তমান শিশুর ভবিষ্যৎ বিকাশ নির্ভর করে তার সযত্ন পরিশোধনের ওপর। অনুকূল পরিবেশে সযত্নে লালিত-পালিত শিশু সুশিক্ষা পেলে সে আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির সুনাম বৃদ্ধি করবে। শিশুদের মনের দুয়ার বড়দেরই খুলে দিতে হবে। তারা যেনো ভাবতে পারে এই গ্রহটি (পৃথিবী) তাদের বিদ্যালয় আর এখানকার মানুষগুলো সব তাদের শিক্ষক। শিশুর মধ্যে সংগোপনে লুকিয়ে থাকা আকাঙ্ক্ষাটি আমাদের জাগিয়ে দিতে হবে। কড়া নাড়তে হবে তাদের বড়ো হবার স্বপ্নের মণিকোঠায়। শিশুদের সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী

www.phulkuri.org.bd

করে তুলতে হবে। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। তার রয়েছে নিজস্ব মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি। উপযুক্ত শিক্ষার পরশে শিশুর মধ্যে এ সুপ্ত গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানো সম্ভব। শিক্ষাই মানুষের এ সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে এবং মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। আমাদের শিশুরা শিক্ষা পেলে, জ্ঞানের সন্ধান পেলে কবির ভাষা বলে উঠবে–

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।"

অথবা– "আকাশ আমায় শিক্ষা দিলো
উদার হতে ভাইরে
বায়ুর কাছে কর্মী হবার
মন্ত্র আমি পাইরে।"

আমরা শিশুদের জন্য কতটুকুই বা করতে পারছি। উপযুক্ত পরিবেশ আর শিক্ষার অভাবে কত শিশুই ঝরে পড়ছে। ভবিষ্যৎ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তারপরও আমাদের শিশুরা পিছিয়ে নেই। বিশ্বসভায় তারাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, সাংবাদিকতা, সমাজকল্যাণ সব ক্ষেত্রেই আমাদের শিশুদের সরব পদচারণা রয়েছে।

অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও জ্ঞানের প্রতি নিরন্তর আগ্রহ নিয়ে শিশুদের এগিয়ে যেতে হবে অনেক দূর। একটি সুন্দর জীবন, একটি সুন্দর বাংলাদেশ ও একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ার প্রত্যাশায় এ শিশুদের যথোপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের।

কাজ ও আনন্দ

কিছু করতে পারার মধ্যে একটা বিরাট আনন্দ আছে। অনাবিল সে আনন্দ; যা তোমাকে প্রতিষ্ঠা দিবে। কিন্তু করতে না পারার একটা অজানা শঙ্কা তোমাকে পিছু ডাকবে। কেন এ ভয়? মানবীয় প্রবণতার মধ্যে কিছু দুর্বল দিক থাকে। এটা তেমনি একটা বিষয়। এ ভয়, লোকভয়। কবি বলেছেন–

'করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।'

এই সঙ্কোচটুকু ঝেড়ে ফেলতে হবে। মানুষে কি বলবে! তাতে তোমার কিছু আসে যায় না। তুমি যে কাজটি করছো, তা সৃজনশীল কিনা, সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে কিনা? সেটাই বড় কথা। সবার ভেতরই প্রতিভা থাকে। মেধার স্ফূরণ ঘটাতে হবে। ধর; তুমি এক টুকরো কাগজে Fire লিখে শার্টের বুক পকেটে রেখে দিলে। তুমি এর কোনো উত্তাপ অনুভব করবে না। এ থেকে কল্যাণ বা ধ্বংস কিছুই সাধিত হবে না। যখন তুমি পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালাবে তখন আলো বিচ্ছুরিত হবে। অন্ধকারে পথিক পথ চলতে পারবে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া নিরন্ন মানুষটির ধমনীতে সাড়া জাগাবে। আবার এই শক্তির অপব্যবহার করলে ধ্বংস ডেকে আনবে। ধ্বংস আমাদের কাম্য নয়। তা আমরা করতে যাবো না।

কাজ করতে গেলে সফলতা ও ব্যর্থতা দুটোর সঙ্গেই সাক্ষাৎ হতে পারে। অকৃতকার্যতায় আমরা অনেকে দমে যাই। দমে গেলে চলবে না। তোমাকে যে পারতেই হবে। বলা হয় অকৃতকার্যতাই সাফল্যের স্তম্ভ। এ জন্য চাই অধ্যবসায়। বারবার চেষ্টা করার নামই হল অধ্যবসায়।

www.phulkuri.org.bd

রবার্ট ব্রুস স্কটল্যান্ডের রাজা, স্বাধীনতা হারিয়ে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ৬ বার যুদ্ধ করেছেন শত্রুর বিরুদ্ধে। কিন্তু পরাজিত হয়েছেন। পাহাড়ের গুহায় বসে আছেন। হঠাৎ দেখেন একটি মাকড়সা জাল বিস্তারের জন্য নিচ থেকে ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে এবং বার বার মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। মাকড়সা তবু চেষ্টা থেকে বিরত হচ্ছে না। অবশেষে সে একবার সফলতা অর্জন করল। রবার্ট ব্রুস এবার উঠে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, চেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। তিনি আবার সৈন্য সংগ্রহ করলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সপ্তমবারে বিজয়ী হলেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি তোমরা অনেক কিছু করতে পারো। মানুষের বিচিত্র শখ থাকে। বাগান করা, পাঠাগার গড়া, সংগীত চর্চা, আবৃত্তি, ছবি আঁকা কত কি! এ সবই মানুষের সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে।

রেল লাইনের ওপর দিয়ে সাইকেল চালানো বা পানির নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকার মতো দুরূহ কাজেও মানুষ সফল হয়েছে, অধ্যবসায়ের মাধ্যমে। এসব কাজে সমাজের কোনো কল্যাণ হয় না। বরং কেউ অনুকরণ করতে গেলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। অর্থহীন কাজ আমরা করব না।

কিছু করার জন্য প্রথমেই চাই সদিচ্ছা। তারপর পরিকল্পনা, উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানঅর্জন। দেখবে তোমার কাজটি সহজ হয়ে গেছে। মানুষের সত্যিকার পরিচয় তার কর্মে ফুটে ওঠে। আভিজাত্য বা বংশ পরিচয় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। সৃজনশীল কোনো কাজের সুফল তুমি শুধু একাই পাবে না। দেখবে সমাজও তা ভোগ করছে। এখানেই তোমার সার্থকতা। মহানবীর (সাঃ) কাছে একজন ভিক্ষুক এসে কিছু চাইল। নবীজি বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই নেই? ভিক্ষুক বলল, শুধু একটি কম্বল আছে হুজুর। দয়ার নবী বললেন, যাও সেটি নিয়ে এসো। ভিক্ষুক কম্বলটি এনে নবীজির হাতে দিল। মহানবী (সা:) তা বিক্রি করে লব্ধ টাকা দিয়ে একটি কুঠার কিনে ভিক্ষুকের হাতে দিয়ে বললেন, এখন থেকে বনের কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ কর।

এতে ভিক্ষুকটি নিজে উপকৃত হলো এবং সমাজ ভিক্ষার অভিশাপ থেকে বাঁচলো।

রাসুল (সাঃ) এর এই মহান কাজটি নিয়ে একটু ভাব। দেখবে তোমার মধ্যেও কাজের একটা ভুবন তৈরি হয়েছে।

সৎ কাজে মানুষকে উৎসাহিত করা, কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকা ইসলাম ধর্মের প্রাণশক্তি। এই কাজটির চর্চা কমে গেছে। আমরা বন্ধুদের ভালো কাজে উৎসাহ দিতে পারি। মন্দ কাজ বর্জন করতে বলতে পারি। এতে সমাজ-সংসারে শান্তি নেমে আসবে।

গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে কখনও পথ চলেছ? পথিকের ঘাম ঝরে পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়। চাই একটু সবুজ ছায়া, একটু শীতল পরশ। পথের বাঁকে বটবৃক্ষটি ছায়া দিচ্ছে। একটু জিরানো যায়। পথিক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, প্রাণটা জুড়িযে যায়। কে রোপণ করেছে এই গাছটি? হয়ত সে অজ্ঞাত, কিন্তু তার কর্মটি অনেক বড়।

পথ চলতে গিয়ে হয়তো দেখলে, পথের ধারে এক চিলতে চালা ঘরে মাটির কলসে পানি রাখা আছে। পথিক পান করে চলে যাচ্ছে। কে পানি পান করাচ্ছে, পথিক তা জানে না। যিনি পান করাচ্ছেন তিনি আত্মপ্রচার চাচ্ছেন না। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আগের দিনে এমন উদাহরণ অনেক ছিল। তখন মানুষের জন্য মানুষের একটা আবেগ ছিল, ভালোবাসা ছিল। এখন মানুষ ক্রমেই যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। আমরা কি পারি না ভালোবাসার সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে। নিশ্চয়ই পারি। তোমরাও তা পারবে। আমাদের দেশে শিক্ষার হার খুব কম। তুমি আশপাশের অনেক নিরক্ষর মানুষের দেখা পাবে। একটু উদ্যোগী হলেই তুমি একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে অক্ষর জ্ঞান দান করতে পার। বাসায় কাজের ছেলেটিকে না হয় প্রথম বেঁছে নাও। ওকে স্বাক্ষর জ্ঞান দান কর, এটা একটা বড় কাজ হবে তোমার জন্য।

মহানবী (সাঃ) দশজনকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে একজন যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিরক্ষরতা দূর করতে পারলে সমাজ হয় আলোকিত। আলোকিত মানুষ চাই। ভালো কাজের মাধ্যমেই মানুষ আলোকিত হতে পারে।

www.phulkuri.org.bd

নিজের কাজে লজ্জা নেই

নিজের কাজ নিজে করার মধ্যে কোনো লজ্জা নেই। এই সত্য কথাটি খুবই সুন্দর। তুমি যদি উপলব্ধি করতে পার, তবে গর্বিত হতে পারবে। একটু গল্পের মতো করে ভাবা যাক। মৌমিতা রোজ ভোরো উঠে নিজের বাগানে ফুল গাছে পানি দেয়। গাছের পরিচর্যা করে। প্রতিবেশী একজন এসে বললো, "মৌমিতা তুমি কি মালী না কাজের মেয়ে যে, গাছে পানি দিচ্ছো।" যে বলল সে নিজেকে ছোট করল। হীনমনের পরিচয় দিল। এতে মৌমিতার কিছু আসে যায় না। মৌমিতা যে কাজটা করছে তা ওর নিজের।

আর এই কাজের জন্য একদিন বাগানে ফুল ফুটবে। পরীরা এসে জুটবে। ভ্রমররা গুঞ্জন তুলবে। সুবাসিত হবে ভোর। ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবে সবাই। মৌমিতার মনটাও আনন্দে ভরে উঠবে। তোমরা যারা তেরতে পা দিয়েছ, তারা নিজেরা নিজেদের কাজ করতে পার। সাজাতে পার জীবনটাকে। এমন একটা সময় থাকে যখন বাবা-মা সব কাজ করে দেন। আমরা বড়দের ওপর নির্ভরশীল থাকি। তারপর ধীরে ধীরে নিজের কাজ নিজে করতে শিখতে হয়।

স্কুলে যাবার প্রস্তুতির কিছু কাজ তোমরা রাতেই সেরে ফেলতে পার। যেমন ধর, স্কুলব্যাগ গুছিয়ে রাখা, জুতা ব্রাশ করে রাখা, ড্রেসটা ঠিক ঠাক করে রাখা। তাহলে সকালে ঝামেলায় পড়তে হবে না। যে কাজটা আগে মা-বাবা করে দিতেন সে কাজটা তুমি নিজে করলে। এতে মা-বাবার অনেক সুবিধা হয়।

স্কুল থেকে ফিরে আবার সব কিছু গুছিয়ে রাখা দরকার। অনেকে স্কুল থেকে ফিরে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। এটা দেখতেও অসুন্দর, আবার

www.phulkuri.org.bd

নিজের প্রতি অবহেলার শামিল। জামা জুতো ব্যাগ যথাস্থানে না রাখলে মা'র কাজ বেড়ে যায়। তুমি হয়ত প্রয়োজনের সময় কাজের জিনিসটি হাতের কাছে পাবে না।

পড়ার টেবিলটা নিজে গুছিয়ে রাখ। ঘরটা পরিষ্কার করে রাখ। দেখবে তোমার রিডিং রুমটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো ঈমানের অঙ্গ।" পরিষ্কার থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে। পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা, বাইরে থেকে এসে হাত-মুখ ধোয়া, রাতে ঘুমাবার আগে দাঁত ব্রাশ করা, সপ্তাহে একদিন হাত-পায়ের নখ কাটা প্রভৃতি পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে। যে পরিষ্কার থাকে তার অসুখ-বিসুখ কম হয়। সবাই তাকে পছন্দ করে।

যখন ঘরে থাকবে তখন ঘরের কাজে মাকে সাহায্য করতে পার। আবার সাহায্য না করলেও মার কাজটা গভীরভাবে লক্ষ্য করবে।

তিনি কিভাবে করেন, সেভাবে করতে শিখবে। মা আলনা গুছাচ্ছেন, তুমি তার সাথে সহযোগিতা করলে। রান্না-বান্নার কাজেও মাকে টুকিটাকি সাহায্য করা যায়। বড় হয়ে নিজেদের আরও কিছু ভারী কাজ নিজে করতে শিখবে। নিজের বিছানা করা, জামা কাপড় ইস্ত্রি করা, নিজের ড্রেসটা নিজে যত্ন করে ধোয়া ইত্যাদি।

বাবা-মা বা কাজের বুয়ার ওপর নির্ভরতা যত কমাতে পারবে দেখবে নিজের কাছেই ততো ভাল লাগবে। শুধু নিজের কাজ নিজে করা কেন, ছোটদেরও তোমরা সাহায্য করতে পারো।

ছোট ভাই বা বোনটার দাঁত ব্রাশ করা ঠিকমত হচ্ছে কি না? দেখা। জুতোর ফিতাটা বেঁধে দেয়া, স্কুলে যাবার আগে একটু তৈরি করে দেয়া, দেখবে তোমার ওপর বাড়ির সদস্যদের আস্থা বাড়ছে। দেখবে ক্রমেই তুমি একজন দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে উঠছো। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হলো অলসতা। আর অলস লোকে কিছুই করতে পারে না। অলস লোকেরা নিজেদের জীবনে দুঃখ ডেকে আনে।

www.phulkuri.org.bd

আলস্য ঝেড়ে ফেলার বড় রেমেডি হল প্রমিজ। তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তুমি করবে, তোমাকে করতেই হবে। একেই বলে প্রবল ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। তুমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে? এ জন্য তোমার প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছাশক্তির। ছবিটা আঁকা হচ্ছে না। অংকটা মিলছে না। এখন ভালো লাগছে না, ফেলে রাখলাম তা করলে চলবে না।

এটা তোমার নিজেরই কাজ। বার বার কর। ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাও দেখবে তুমিও পারবে। আলস্য তোমাকে আর পিছু ডাকবে না। তখন কর্মই তোমাকে বড় করে তুলবে। আত্মবিশ্বাস স্বনির্ভরতাই তোমাকে সাহস জোগাবে। তুমি হয়ে উঠবে সাহসী।

জীবনের শুরুটা সুন্দর হোক

জীবনের শুরুটা সুন্দর হওয়া চাই। শিশুর মুখের আধো আধো বোল খুব সুন্দর। এক সময় তা উদ্ভাসিত কথামালায় রূপ নেয়। এরপর শিশুটি হাতের কাছে এক টুকরো কাগজ আর কলম পেলে কতকি আঁকিবুকি শুরু করে। আরেকটু বড় হলে সুন্দর করে বর্ণমালা লেখে। একটি শিশু পরিবার থেকে পরিবেশ থেকে শেখে। শেখে বড়দের কাছ থেকে। শিশুদের গড়ে তুলতে বড়দের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু তোমরা যারা এখন স্কুলে যাও তারা একটু সচেতন হলে অনুশীলনমুখী হলে কিছু কিছু বিষয় নিজেরা রপ্ত করতে পারো। এই ধরো "সুন্দর হাতের লেখা।"

সুন্দর হাতের লেখা কে না পছন্দ করে। কারো মন জয় করতে চাই সুন্দর হাতের লেখা। সুন্দর লেখা সুন্দর মনের পরিচায়ক। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এটাকে বলে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। বর্ণমালা এক রকম হলেও দশজনের হাতের লেখা দশ রকম হয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কারণেই। তারপরও প্রত্যেকের হাতের লেখার মধ্যে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এটা মহান প্রভুরই একটা অভিজ্ঞান। যাতে কেউ কাউকে নকল করতে না পারে। হাতের লেখা এমনি এমনি সুন্দর হয়ে ওঠে না। এ জন্য চাই অনুশীলন। তোমাকে বেশি বেশি করে লিখতে হবে। ভালো হাতের কোনো লেখা অনুকরণ করা যেতে পারে। বর্ণমালার গঠন প্রকৃতি লক্ষ্য করো। সেভাবে লেখো। বর্ণমালার গঠন রীতি নিয়ে প্রচুর অনুশীলন ও গবেষণা হচ্ছে। যার ফসল ক্যালিগ্রাফি বিজ্ঞান। আরবি ক্যালিগ্রাফি প্রসিদ্ধ হলেও আজ বাংলা ক্যালিগ্রাফি চর্চা হচ্ছে। তোমাদের

www.phulkuri.org.bd

মতো অনেক শিশু শিল্পী ও বড়রাও এতে ভালো করছেন। চেষ্টা করে দেখো না; তুমিও পারবে।

মানুষের সহাজাত প্রবৃত্তি হলো, সে নিজেকে তুলে ধরতে চায়। প্রকাশ করতে চায় (Enlighten)। এটা কিন্তু দোষের কিছু নয়। আমরা অনেকে মিছেমিছি একটা সংকোচবোধ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখি। এটা ঠিক নয়। সুন্দর করে লেখো। শুদ্ধ সুন্দর ভাষায় কথা বলো। জ্ঞান অর্জনে উৎসাহী হও। আচরণে সৌজন্যতা প্রকাশ করো। দেখবে তুমি অন্যের দৃষ্টি কাড়তে পারবে। অপরের কষ্টে দুঃখ প্রকাশ করো। কারো সাফল্যে অভিনন্দন জানাও। বড়কে সম্মান করো। ছোটকে স্নেহ দাও। দেখবে তুমি সবার কাছের মানুষ হয়ে উঠবে।

পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো একটা বড় বিষয়। নতুন পরিবেশে অনেকে সমস্যায় পড়ে যায়। যে কোনো পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার মনের দৃঢ়তা থাকতে হবে। তোমার পোশাকটা দামী নয়। তুমি দেখতে অত সুন্দর নও। তুমি গ্রাম থেকে এসেছো। এগুলো কিন্তু কোনো বিষয় নয়। তুমি তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে কাজে লাগাও। পরিবেশের যা কিছু সুন্দর তাকে স্বাগত জানাও। অসুন্দরের গঠনমূলক সমালোচনা করো। দেখবে তুমি জায়গা করে নিতে পারবে। দার্শনিক এমারসন বলেছেন, প্রত্যেক মহৎ কাজ নিজের জন্য পথ করে দেয়।

ভালো কাজের জন্য লজ্জা নয়। খারাপ ও পাপ কাজে লজ্জা পেতে হবে। তুমি মার্জিত পোশাক পরলে অপরের উপকার করলে, যতটুকু জানো নির্দ্বিধায় প্রকাশ করলে, নিজের কাজটা নিজে করলে, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। বরং তুমি নিজেকে তুলে ধরতে পারবে।

একজন অদ্ভুত ধরনের চুল কাটলো, খাটো (Short) পোশাক পরলো, অশ্লীল বাক্য বলতে লজ্জাবোধ করলো না। লোকে তাকে মন্দ বলবে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।" লজ্জাশীলতাকে তাই চরিত্রের ভূষণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

পুঁথিগত লেখাপড়ার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করো। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। এতে তোমার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ

হবে। ভাষা শিখতে পারবে। ভাবের বিস্তৃতি ঘটবে। তোমার ভেতর তৈরি হবে একটা নতুন ভুবন। সে ভুবনের আলোয় জেগে উঠবে সকলে। শেখ সাদী (রহঃ) বলেন, একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আর একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না। তাই আলোকিত হতে হবে সবাইকে। তা কেবল বই পড়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

সৃজনশীল কাজের প্রতি অনুরাগ থাকা চাই। খেলার মাঠে, লাইব্রেরিতে, বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, আবৃত্তি-আলোচনায় অংশ নিতে হবে। তোমার জড়তা কেটে যাবে। তোমার মধ্যে সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটবে ধীরে ধীরে।

www.phulkuri.org.bd

সত্য বলবো সত্য গ্রহণ করবো

চরিত্র গঠনের অন্যতম একটি উপাদান হলো সত্যবাদিতা। সত্যকথা বলা। সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। যে সত্য কথা বলে তাকে সত্যবাদী বলে। সত্যবাদী লোককে সবাই বিশ্বাস করে, ভালোবাসে ও সম্মান করে। সত্যবাদী ব্যক্তির মনোবল থাকে দৃঢ়। সে কাউকে ভয় করে না। তাই গুরুজন সন্তানকে প্রথম যে পাঠ দেন তা হলো, 'সদা সত্য কথা বলিবে।"

যে মিথ্যা কথা বলে তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। তাকে কেউ ভালোবাসে না। সত্যবাদিতা আল্লাহ পছন্দ করেন। সত্যবাদী লোকেরা আল্লাহকে ভয় করে। একবার এক লোক এসে আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বললো, আমি অনেক খারাপ কাজ করি। সব মন্দকাজ আমার পক্ষে একবারে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে একটি পাপকাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিন। মহানবী (সাঃ) বললেন, ঠিক আছে, তুমি মিথ্যা কথা বলবে না।

লোকটি বললো, এ তো খুব সহজ কাজ। পরে দেখা গেলো, মিথ্যা কথা ছাড়ার কারণে লোকটির পক্ষে আর কোনো খারাপ কাজ করা সম্ভব হলো না। কারণ, সে ভাবলো কেউ অপরাধের কথা জিজ্ঞেস করলেই তো মিথ্যা বলতে হবে। আর মিথ্যা তো বলা যাবে না। এভাবে শুধু মিথ্যা বলা ত্যাগ করায় লোকটি সব রকম খারাপ কাজ থেকে বেঁচে গেলো।

তোমরা হযরত বড়ো পীর শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর নাম শুনে থাকবে। তিনি একজন মস্তবড় আল্লাহর ওলী ছিলেন। শৈশবেই তার পিতা মারা যান। স্নেহশীল খোদাভীরু জননীর হাতেই তিনি মানুষ হন। গৃহের শিক্ষা শেষ করে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ শহরে যাবার

www.phulkuri.org.bd

মনস্থির করলেন। মা ছেলের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন। মা পুত্রকে একদল বাগদাদগামী যাত্রীর সাথে শামিল করে দিলেন। যাবার আগে মা তাকে পথের জন্য কিছু খাবার আর চল্লিশটি দিনার সঙ্গে দিয়ে দিলেন। পথে চোর-ডাকাতের ভয় থাকায় দিনার কয়টি তার জামার বগলের নিচে সেলাই করে দিলেন। মা পুত্রকে বলে দিলেন, দেখ বাবা, যতোবড় বিপদই আসুক না কেনো, এমনকি নিজের প্রাণ গেলেও কখনো মিথ্যে কথা বলো না।

পথে একরাতে দলের ওপর ডাকাত চড়াও হলো। দুর্বৃত্তরা সকলের সবকিছু লুটপাট করে নিলো। একজন ডাকাত বালক আব্দুল কাদের (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, এই ছেলে তোমার কাছে কি আছে? তিনি নির্দ্বিধায় বললেন, হ্যাঁ আমার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে। ডাকাত দলের সবাইকে তিনি একই কথা বললেন। ডাকাতরা তার কাপড় ছিঁড়ে দেখলো সত্যিই তার কাছে চল্লিশটি দিনার আছে। ডাকাতরা শিশুটির মাতৃভক্তি ও সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হলো। এই ঘটনায় ডাকাতরা তওবা করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফিরে আসলো।

সত্যের জয় সর্বত্র। বস্তুবাদী দার্শনিক গোয়েবলসের একটা থিউরি আছে, একটি মিথ্যা দশবার বললে তা সত্যে পরিণত হয়। তার এই কথা যথার্থ নয়। কিছু সময়ের জন্য হয়তো মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখা যায়। কিন্তু সত্যের আলো উদ্ভাসিত হবেই। পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে– 'সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত।' রাসুল (সাঃ) বলেছেন, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ডেকে আনে ধ্বংস।'

তাই বন্ধুরা এসো আজ থেকে আমরা সত্য বলবো, সত্যকে গ্রহণ করবো। আর মিথ্যাকে বর্জন করবো।

www.phulkuri.org.bd

পড়া-লেখায় আনন্দ খুঁজে পেতে হবে

অ্যাসেমব্লি'র (Assembly) সময় মৌটুসীকে তার ম্যাম আবিষ্কার করেন ক্লাসরুমে। তিনি ভেবে পান না এই মিষ্টি মেয়েটি কেন অ্যাসেমব্লিতে অ্যাটেন্ড (Attend) করেনি। প্রশ্ন করায় ও বলে, এমনি যাইনি। আসলে মৌটুসীর মধ্যে একটা নির্লিপ্ততা লক্ষ্য করা যায়। শিশুরা শান্তশিষ্ট হবে আবার দুষ্টুমিও করবে এটাই স্বাভাবিক। একেবারে নির্লিপ্ত থাকাটা ভালো নয়। নির্লিপ্ত হলো সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা। এই অন্তর্মুখিতা বা ঘরকোণে স্বভাব শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য পরিবারের পরিবেশ, পিতা-মাতার ভূমিকা অনেকাংশে দায়ী। উপর্যুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সাহচর্যে শিশুরা এ রকম সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে।

নতুন পরিবেশে কেউ নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে তার মধ্যে এক ধরনের অন্তর্মুখিতা কাজ করে। ধরো সে ভিনজেলা থেকে এসেছে। তার ভাষায় কিছুটা আঞ্চলিকতা আছে। এখন তোমরা সব মিলে যদি তার কথার টিপ্পনী কাটো, তবে সে আরো হতাশ হবে। এটা না করে তোমরা তাকে সহযোগিতা করো। তাকে সব কাজে ডাকো। দেখবে তার স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে।

আমি যদি তোমাদের প্রশ্ন করি, তোমরা ক্লাসে লেখাপড়ার পাশাপাশি আর কি করো? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে, হৈ... চৈ করি। আমি এক্ষণে একটু অন্য রকম হৈ... চৈ করার কথা বলবো।

সুন্দর হাতের লেখা : পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের জন্য সুন্দর হাতের লেখা চাই। যার হাতের লেখা ভালো সে একজন শিল্পীও বটে। তার কদর সবার

www.phulkuri.org.bd

কাছে। আজকাল সুন্দর হাতের লেখার প্রতিযোগিতা হচ্ছে তাতে অংশ নাও।

নিজের ভাষায় লেখো : যে বিষয়বস্তু না বুঝে শুধু মুখস্থ করে সে তার প্রতিভা ধ্বংস করে। যা পড়বে বুঝে পড়বে। বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে তা নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করবে। মানুষ শুধু বই পড়েই শেখে না। ভ্রমণ করে, চোখে দেখেও শেখে। তুমি দু'চোখে যা দেখো তা নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করো।

বই পড়ার আনন্দ : জানতে হলে পড়তে হবে। তোমাকে পড়ার মাঝে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। যত পড়বে তোমার ভাষা, সাহিত্য ততো সমৃদ্ধ হবে। তোমাকে পড়ার মাঝে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। যত পড়বে তোমার ভাষা, সাহিত্য ততো সমৃদ্ধ হবে।

সঠিক উচ্চারণ : কথা বলার সময় শব্দের সঠিক উচ্চারণ করলে ভোষার সৌন্দর্য ফুট ওঠে। শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য তোমরা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী 'ব্যবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারো।

আবৃত্তি চর্চা : কবিতা আবৃত্তির চেষ্টা করো। নামকরা আবৃত্তিকারের ক্যাসেট শোনো। ক্লাসে অবসর সময়ে তোমরা বন্ধুরা মিলে আবৃত্তির আসর জমাতে পারো। সাহিত্যের ক্লাসে ভালো আবৃত্তির জন্য স্যারের সহযোগিতা নাও।

শব্দ করে পত্রিকা পড়ো ; তোমরা প্রতিদিন কমবেশি খবরের কাগজ পড়ে থাকো। কিন্তু উচ্চস্বরে কি কেউ পড়ো? শব্দ করে কিছুক্ষণ পত্রিকা পড়ো। অভ্যাসটা গড়ে তোলো। হাতের কাছে রেকর্ডার থাকলে তাতে রেকর্ড করো। এরপর শোনো– কোথায় ভুল উচ্চারণ হচ্ছে, কোনো জায়গায় বলার মধ্যে আঞ্চলিকতা আসছে কিনা। এই চর্চাটা একদিন কাজ দিবে। বড় হলে টেলিভিশনে খবর পাঠের সুযোগ পেয়ে যেতে পারো।

শুদ্ধ করে কথা বলার চেষ্টা : বলায় ও কথায় আঞ্চলিকতা পরিহার করতে হবে। তোমার পরিবেশে শুদ্ধ করে কথা বলতে লোকলজ্জা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। পাছে লোকে কিছু বলে– এমন সঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলতে হবে।

www.phulkuri.org.bd

সাধারণ জ্ঞানের চর্চা : পুঁথিগত বিদ্যার বাহিরেও তোমাকে প্রচুর জানতে হবে। এজন্য তোমরা বন্ধুরা মিলে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা করো। পত্র-পত্রিকা চর্চা করো। পত্র-পত্রিকা টিভি ও বিভিন্ন সংগঠন সাধারণ জ্ঞান (কুইজ) প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। তাতে অংশ নাও।

এখন তাহলে এ বিষয়গুলো নিয়ে একটু ভাবো।

জীবনে চাই সুষমা শৃঙ্খলা

বর্তমান সময়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অনেক রাত জেগে টেলিভিশন দেখে অনেক বেলা করে ওঠার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার ওই ছেলেটিই ক্লাসের পাঠ তৈরি করে–

Early to bed and
Early to rise
Makes a man
Healthy wealthy and wise.

দেখা যাচ্ছে কথার সাথে কাজের কেনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনীষী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ভোরবেলায় ডেকে দেয়ার জন্য চাকরকে প্রত্যেকদিন একটি করে রৌপ্য মুদ্রা দিতেন। পাছে এ কথা শুনে কেউ উপহাস করে, তাই তিনি নিজেই বলে গেছেন যে, এভাবে প্রাতঃকালে উঠবার ফলে তার যে লাভ হতো, তার কাছে ওই সামান্য মুদ্রা কিছুই নয়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত হব, ব্যবহার শিখব এর সুফল ভোগ করবো এটাই স্বাভাবিক। তবে এ সবের একটা খারাপ দিকও আছে সেটাও ভাবতে হবে। সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। ক্যাবল অপারেটররা কখনো নিয়ম নীতি উপেক্ষা করে এমন সব চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখাচ্ছে যা অশ্লীল। পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে দেখার মতো নয়। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, বাবা শখ করে ছেলেকে কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন। ছেলে এর অপব্যবহার করেছে। রাত জেগে ছেলে সিডিতে বাজে ছবি দেখছে। বাবা টের পেয়ে কম্পিউটার বিক্রি করে দিয়েছেন।

একজন শুধু লেখাপড়া করছে পাগলের মতো। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে তার কোনো জগত নেই। আবার একজন শুধু গল্পের বই পড়ছে। ক্লাসের পড়ার কোনো খবর নেই। কেউ হয়তো কম্পিউটারে গেমস খেলে, টিভিতে ছবি দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। এসব কোনোটাই সুখের কথা

www.phulkuri.org.bd

নয়। এসব একঘেয়েমীপনা জীবনের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। দেহ-মনের সুস্থতা ও বিকাশের জন্য শিক্ষা বিনোদন ও শরীর চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা হতে হবে ভারসাম্যপূর্ণ।

ভারসাম্যপূর্ণ জীবনগড়া মানে নিয়মের অনুবর্তী হওয়া। জীবনের সকল কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সমাপণ করার মধ্যে সাফল্য নিহিত। আর পৃথিবীতে বিভিন্ন কাজ ও বিষয়ের যে নিয়ম তা যথাযথভাবে অনুসরণ করার নামই নিয়মানুবর্তিতা। ভারসাম্যপূর্ণ জীবনে পরিকল্পনা নিয়মানুবর্তিতা সময়ের গুরুত্ব ও ইচ্ছাশক্তির অনবদ্য সমাহার ঘটে। আজকাল টিভি চ্যানেলগুলো অনেক ভালো ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে। এ সব অনুষ্ঠান দেখে ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হতে পারে নিঃসন্দেহে। এখন কথা উঠতে পারে সে কোন অনুষ্ঠানটি দেখবে। কখন দেখবে, কত সময় দেখবে। এ সবই নির্ভর করে তার প্রাত্যহিক জীবনের রুটিনের ওপর। খবরের কাগজে টিভি চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানসূচি দেয়া থাকে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকে। তোমরা তা থেকে কোন অনুষ্ঠানটি দেখবে তা ঠিক (Choose) করতে পারো। আর এ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হও, যে অনুষ্ঠানটি তোমার শিক্ষা ও সময়ের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটি তুমি উপভোগ (Enjoy) করবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি সাহিত্য রম্যরসবিষয়ক অনুষ্ঠান দেখবে এটাই দাবি রাখে। মনে রাখবে অতিরিক্ত সব কিছুই খারাপ। ইংরেজিতে একটা কথা আছে। "Time and tide wait for none." আমরা অকারণে কত না সময় অপচয় করি। ভোরে ঘুম থেকে দেরিতে উঠে, রাত জেগে টিভি দেখে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে অপ্রয়োজনীয় আড্ডা দিয়ে সময় পার করি। একবার কি ভেবে দেখেছি এ সময়গুলো সাশ্রয় করে আমরা নিজেদের গড়তে পারি। পড়ার টেবিলে, লাইব্রেরিতে বন্ধুদের সাথে পাঠ আলোচনায় (Study Discussion) সময় দিয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারি।

একটি সমৃদ্ধ জীবনে অনুপম আচরণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কর্তব্য নিষ্ঠা, আল্লাহর ভয়, শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের সমাহার ঘটে। মানুষ প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু তাকে নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করতে হয়। মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করলেই সে পরিপূর্ণ মানুষ হয় না। তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে বিভিন্ন

www.phulkuri.org.bd

মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে হয়। যাকে এক কথায় বলা যায় মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হলে তাকে প্রচুর পরিশ্রম যত্ন ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় একজন মানুষের জীবনে পূর্ণতা লাভে যে জিনিসটির বেশি প্রয়োজন তা হল, সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে, প্রকৃতিতে নিয়ম মেনে চলার একটা সৌন্দর্য বিরাজমান। আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই নিয়মের অবাধ গতি। পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। ষড়ঋতু পর্যায়ক্রমে ঘুরে আসে। রাতের পরে দিন আসে, দিনের পর রাত। কোনো কিছুই নিয়মের বাইরে নয়।

প্রকৃতি ও প্রাণিজগতে সর্বত্র নিয়মের রাজত্ব চলছে। পাখিরা ভোরবেলা জেগে গান করে, দিনে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, রাতে বিশ্রাম করে। এদের সবকিছুই রুটিন মাফিক হয়ে থাকে। মৌমাছি, পিপীলিকা দল বেঁধে তাদের নেতার নির্দেশ মেনে চলে। মৌমাছি মৌচাক নির্মাণ করে সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করে।

প্রকৃতি নিয়মানুবর্তিতার এক বিশাল দৃষ্টান্ত। জোয়ার-ভাটা গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন, বীজের অংকুরোদগম, নদীর সাগর পানে ছুটে চলা- এসবই নিয়মের উদাহরণ। প্রকৃতিজগতে শৃঙ্খলা আছে বলেই সেখানে গোলযোগ নেই। নেই কোনো বিশৃঙ্খলা।

মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। তাই মানবজীবনও এই একই সুতোয় গাঁথা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলাই শৃঙ্খলা। নিয়মের অর্থই সুষমা ও শৃঙ্খলা। একে স্বীকার করে অনুশীলনের মাধ্যমে জীবন সুন্দর ও সার্থক করা যায়।

শৈশবই হলো শৃঙ্খলা অনুশীলনের সঠিক সময়। এর ওপরই নির্ভর করে ভবিষ্যৎ জীবনের সফল প্রতিষ্ঠা।

Nepoleon বলেছেন, মানব জীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য সমাজে গড়ে তুলেছে নিয়মমালা। এসব নিয়মের অনুসরণ জীবন বিকাশের জন্য সহায়ক।

নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষা ও চর্চার উপযুক্ত সময় হচ্ছে ছাত্রজীবন। তোমরা যারা ছাত্র নিয়মিত লেখাপড়া করবে। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিবে। কথায় বলে

www.phulkuri.org.bd

খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া। এভাবে নিয়ম পালনে অভ্যস্ত না হলে জীবনে সার্থকতা আসে না।

ভোর থেকে রাতের ঘুমের আগ পর্যন্ত থাকে মানুষের নানা কাজ। গোসল, আহার, প্রার্থনা, শরীরচর্চা, পাঠ্যাভ্যাস, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ভ্রমণ ও বিনোদন ইত্যাদি কাজ যদি যথাযথ নিয়মে ও শৃঙ্খলার সাথে পালন করা হয় তবে মানসিক প্রশান্তি ও শারীরিক সুস্থতা লাভ করা যায়।

অনেকে নিয়মের বাধ্যবাধকাতাকে 'শৃঙ্খল' বলে ভুল করে। তারা মনে করে এতে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকে না। মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। এ কথা মোটেও ঠিক নয়। নিয়ম পালনের মাধ্যমেই অধিকার রক্ষিত হয়। ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশের পথকে সুগম করে। অনিয়ম স্বেচ্ছাচারিতা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। সমাজে অশান্তি ডেকে আনে।

বন্ধুরা, নিয়মভঙ্গের ফলাফল সর্বদাই অশুভ। ব্যক্তি সমাজ বা জাতীয় জীবনে যে কোনো নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এ শুধু প্রকৃতিতে নয়, মানবজীবনেও সত্য। আমরা ওহুদ যুদ্ধের কথা জানি, সেখানে রাসুল (সাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করে মুসলিমবাহিনী শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে চরম বিপদের সম্মুখীণ হয়েছিল। আমাদের দেশে আমরা সবাই নিয়ম মানার কথা বলি। কিন্তু নিয়ম মেনে চলি ক'জনে? এর কারণ হলো অজ্ঞতা; সচেতনতার অভাব। পশ্চিমের দেশগুলোর শক্তি সম্পদ জ্ঞান ইত্যাদির মূলে রয়েছে তাদের কঠোর শৃঙ্খলাবোধ। সে সব দেশে গভীর রাতেও কেউ নিয়ম ভেঙ্গে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করে না।

যে কোনো জাতির উন্নতির চাবিকাঠি হচ্ছে জাতীয় জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রক্ষা। উচ্ছৃঙ্খল ও ঐক্যহীন জাতি সংহতির অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। তোমাদের বলব, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিয়ম মেনে চলো। আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করো। প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজ ছোট ছোট অর্জনের মধ্য দিয়েই রচিত হয় বড় অর্জনের ভিত।

গতিময় সময়ের সাথে চল

পৃথিবীতে আমাদের অসংখ্য চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সময় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। সময় মূল্যবান সম্পদ। সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহারের ওপরই জীবনের প্রকৃত সাফল্য নির্ভরশীল। সময়ের কাজ সময়ে না করলে মানবজীবন শুধুমাত্র বৈচিত্র্যহীন একটি সময়ের পরিধিতে পর্যবসিত হয়। আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে গৌরবময় স্মরণীয় ও বরণীয় করে তোলার একমাত্র উপায় হচ্ছে ছন্দময় ও গতিময় সময়ের সাথে নিজেকে কর্মমুখর রাখা। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "Time and tide wait for none" অর্থাৎ সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। যে সময় একবার অতিক্রান্ত হয়ে যায়, শত সাধনা করেও তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। বাস্তবে আমরা কি দেখি- অকারণে আমরা কত না সময় নষ্ট করছি। অযথা আড্ডা দিয়ে, গল্প-গুজব করে ও আলস্যে সময় পার করে দিচ্ছি। অবশ্য নির্দোষ আড্ডা বিনোদন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। সে কথা ভিন্ন।

মানবজীবন সংক্ষিপ্ত। এ সংক্ষিপ্ত জীবনকে ধন্য করে তুলতে হলে প্রতিটি মুহূর্তকেই কাজে লাগাতে হবে। মূল্যবান সময় অকারণে অতিবাহিত হলে জীবনে ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী হবে। সঠিক সময়ে কাজ না করলে পরবর্তীতে অনুতাপ আর হা-হুতাশ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

তোমরা এখন যে সময়টা অতিবাহিত করছো, সেটা খুবই গরুত্বপূর্ণ। কেননা ছাত্রজীবন ভবিষ্যৎজীবনের ভিত্তিভূমি। ছাত্রজীবনে অর্জিত জ্ঞান ও ফলাফল ভবিষ্যৎজীবনের পুঁজি। শিক্ষাবর্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিধিতে আবদ্ধ। এ সময়ের মধ্যে নির্ধারিত লেখাপড়া সমাপ্ত করতে হয়।

www.phulkuri.org.bd

শিক্ষাবর্ষের এক একটি দিন মুক্তার মতই মূল্যবান। সময়ের মূল্য সম্পর্কে উদাসীন হলে কোনো ছাত্রের পক্ষেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব নয়।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো– মানবজীবন প্রকতপক্ষে কতগুলো মুহূর্তের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। জীবন থেকে একটি দিন চলে যাবার অর্থ হলো, আয়ু একদিন কমে যাওয়া। অর্থাৎ আমরা প্রতিনিয়তই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

তাহলে আমরা আমাদের জীবনকে কতটুকু অর্থবহ করতে পারলাম! এ প্রশ্ন যদি অমরা নিজেদের করতে পারি, তবেই আমরা সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারবো।

একবার প্রাণীজগতের দিকে তাকাও। সেখানে সময়নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাবে। ক্ষুদ্র পিপীলিকা বা মৌমাছিকে এক মুহূর্তের জন্যেও ব্যস্তহীন দেখা যাবে না। কোনো প্রাণীকেই অকারণে আলস্যে সময়ক্ষেপণ করতে দেখা যবে না। মওসুম ও আবহাওয়ার সাথে জীবনকে খাপ খাইয়ে প্রতিটি প্রাণী জীবনকে সাজায়। কবি নবকৃষ্ণ ভট্টচার্য-এর সেই বিখ্যাত কবিতাটির অংশবিশেষ উল্লেখ না করে পারছি না।

"মৌমাছি মৌমাছি
কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াও না একবার ভাই।
ওই ফুল ফোটে বনে
যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময় তো নাই।"

পৃথিবীর ইতিহাসে যাদের নাম লেখা আছে, তারা সকলেই সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সময়মতো কাজ করা তাদের জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সক্রেটিস, আইনস্টাইন, শেক্সপীয়র প্রমুখ মনীষীর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, তারা দিনে তো বটেই গভীর রাত জেগেও স্ব-স্ব কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। এভাবে সময়ের মূল্যায়নের মাধ্যমেই তারা জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন।

সৃজনশীল মানুষ

সৃজনশীল মানুষরা চিরদিন বেঁচে থাকেন। তার কর্ম, তার সৃষ্টি তাকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখে। আর প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে চান তার কর্মের মাঝে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শতবর্ষপরে' কবিতায় বেঁচে থাকার সেই আকুতি আমরা লক্ষ্য করি। আজকের গল্প কবি গুরুকে নিয়ে নয়। অন্য একজন মানুষকে নিয়ে; যিনি তার সৃষ্টি কর্মের প্রতি ছিলেন অসম্ভম রকম বিশ্বস্ত ও আন্তরিক। জীবনবাজি রেখে যিনি নিজের সৃষ্টিকে করে গেছেন আলোকিত।

কালজয়ী উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এই উপন্যাসের লেখক 'অদ্বৈত মল্লবর্মন'-এর কথাই বলছি। ১৯১৪ সালে ১লা জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার গোকর্ণঘাট গ্রামে তার জন্ম। বাবা অধরচন্দ্র মল্লবর্মণ ছিলেন গরিব মৎস্যজীবী। অদ্বৈত যখন খুবই ছোট, তখন মৃত্য হয় তার মা-বাবার। কিছু দিন পরে একে একে মারা যান তার দুই ভাই। একমাত্র বোনও মারা যান বছর কয়েক বাদে। অল্প বয়সেই পরপর এমন বিপর্যয়। দারিদ্র্য আর অবজ্ঞার ফাঁস চেপে বসেছিল শৈশবেই। মাছ ধরা পেশা যাদের, অভাব তো তাদের নিত্যসঙ্গী। ওদিকে জেলের ছেলে বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও কম নয়। সমাজের এক পাশে পড়ে থাকা জেলেরা জানে এটাই চিরকালীন সত্য। এই ছেলে তেমনটা ভাবতে পারেনি। একেবারে ছেলেবেলাতেই সে অন্য আলোয় দুনিয়াটাকে দেখল।

পড়াশোনার প্রতি তার প্রবল আগ্রহ দেখে জেলেপাড়ার কয়েকজন চাঁদা তুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাইনর স্কুলে তাকে ভর্তি করে দেন। পরে উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। প্রথম বিভাগ পান। গোটা জেলেপাড়ায় সাড়া পড়ে যায়। অদ্বৈত হয়ে ওঠে সবার প্রিয়।

www.phulkuri.org.bd

এবার গ্রাম ছেড়ে শহরে। ভর্তি হন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে। এরই মধ্যে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা কবি অদ্বৈতকে চেনাতে শুরু করেছে। পরিচিতি তো বাড়ছে, কিন্তু আর্থিক সমস্যা? সমস্যা এমন দাঁড়ালো যে অসম্ভব হয়ে উঠলো পড়াশোনা চালানোর খরচ জোগানো। বন্ধ হয়ে গেল কলেজের পড়াশোনা। চাকরির সন্ধানে কুমিল্লা ছেড়ে অদ্বৈত কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে সামান্য বেতনে 'ত্রিপুরায়' এবং পরে 'নবশক্তি' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে পত্রিকার সম্পাদক হন। কিন্তু এ সুখ সইল না। ১৯৪১-এ বন্ধ হয়ে গেল 'নবশক্তি'। তখন 'মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় যোগ দেন। পাশাপাশি দৈনিক আজাদ-এ কাজ করেছেন অর্থের প্রয়োজনে। এসব পত্রিকায় বেতন ছিল সামান্য। নিজের খরচ তো আছেই; তারপরও স্বজনদের জন্য টাকা পাঠাতে হতো তাকে। প্রচুর পরিশ্রমে শরীর ভাঙতে থাকে তখনই। মাসিক মোহাম্মদীতেই কালজয়ী উপনাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকাশ হচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে। কিন্তু সাতটি কিস্তি প্রকাশের পর ওই পত্রিকায় চাকরিও ছাড়তে বাধ্য হন। বন্ধ হয়ে যায় 'তিতাস'-এর প্রকাশও।

তিনি তখন 'নবযুগ' 'কৃষক' , যুগান্তর প্রভৃতি কাগজে অস্থায়ী কাজ করছেন। এটা ওটা লিখছেন। চলছে চরম টানাটানি। এমন সময় 'দেশ' পত্রিকায় যোগ দিলেন। 'আনন্দবজার' ও 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হল অসংখ্য লেখা। বিপুল খ্যাতি পেলেন। 'জীবন তৃষ্ণা' নামে আরভিং স্টোন-এর লেখা ভ্যানগগের জীবনীর অনুবাদ করে। দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশ পেয়েছিল রচনাটি।

এমন সুসময়ের ধার ঘেঁষেই এল ফের বিপর্যয়। ধরা পড়ল যক্ষ্মা রোগ। কিন্তু টাকার প্রয়োজনে রোগ লুকিয়ে কাজ করে চলেছেন। একদিন বন্ধুদের সামনে ধরা পড়ে গেলেন। তারা যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন অদ্বৈতকে। রোগ ক্রমশ সাংঘাতিক হয়ে উঠলো।

অদ্বৈত বুঝলেন আর সময় নেই। কিন্তু তার স্বপ্নের উপন্যাসের কিছু পরিমার্জন যে ঘুরছে মাথার ভেতর। মুমূর্ষু প্রায় অদ্বৈত পালিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে। বাড়িতে ফিরেই বসে গেলেন 'তিতাস একটি নদীর

নাম'-এর পরিমার্জনে। সব প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে কাজ চালালেন। এবং কাজ করতে করতে ওখানেই ১৯৫১ সালের ১৬ই এপ্রিল মারা গেলেন এই হার-না-মানা লেখক। মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় সেই পরিমার্জিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস। মাটি আর মানুষের সত্যিকারের জীবনের কাহিনী নিয়ে যে উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে কালজয়ী হয়ে থাকবে চিরকাল।

এতক্ষণে হয়তো তোমারা 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছো। নিশ্চয়ই পড়বে। পড়বে আর স্বপ্ন দেখবে তুমিও অদ্বৈত-এর মতো একজন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক হবে। কবি হবে।

"স্বপ্ন আমার সফল হবে
ব্যর্থ হতে দেব নাকো"।

www.phulkuri.org.bd

লিখতে হলে পড়তে হবে

শিশু মনে ভাবনা জাগে। বিচিত্র সব ভাবনা। ছড়া পড়তে গিয়ে কবিতা পড়তে গিয়ে কবি হবার সাধ জাগে। গল্প পড়তে গিয়ে নিজেকে গল্পের নায়কের মতো মনে হয়। মনে মনে ভাবে আমি কি লিখতে পারবো।

সারি সারি বর্ণমালা, শব্দের পর শব্দ বসিয়ে কিছু একটা দাঁড় করাবার চেষ্টা করে। 'ধ্যাৎ কিছুই হল না'।

সে নিজেই হাসে, নিজেই কাঁদে। হতাশ হবার কিছু নেই। এবারেই হবে এবং হবে। তুমি পারবে।

তুমি লিখবে? তাহলে তোমাকে প্রচুর পড়তে হবে। লিখতে পারার ভেতর একটা অনাবিল আনন্দ আছে। এই আনন্দটাই তোমারকাম্য। তোমাকে পড়ার মাঝে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হল মানবচিত্তে নির্মল আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত করা। বই মানব মনে সঞ্চার করে অনাবিল আনন্দ। বই মানুষকে জ্ঞান দেয়। বই মানুষকে যোগ্য করে তোলে। জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের সুযোগ করে দেয়। তাই পড়তে হবে। পড়তে পড়তে দেখবে তোমার ভেতরে এক নতুন ভুবনের সৃষ্টি হয়েছে। খণ্ড খণ্ড অনেক অনুভূতি ভাবনার ঢেউ তুলে তোমায় আচ্ছন্ন করছে। তুমি তখন মনের অজান্তে দু'কলম লিখে ফেলতে পারবে।

বিখ্যাত লেখক টলস্টয় মনে করতেন, লেখাটা কেবলমাত্র প্রতিভার ব্যাপারই নয়, বরং অন্য যে জিনিসটি তুমি করতে চাও তারই মতো অনুশীলনের বিষয়। টলস্টয় তার একটা লেখাকে বার বার সংশোধন করতেন। ক্রমাগত অনুশীলনের পর তিনি তার চিন্তাকে কাগজ-কলমে রূপ দিতেন।

www.phulkuri.org.bd

এই বিখ্যাত লেখকের লেখা সম্পর্কে তার মেয়ে আলেক্সান্দ্রা টলস্টয় লিখেছেন, সে তার পিতার পাণ্ডুলিপি ঘেটে এমনও লেখা পেয়েছেন, যা পড়লে মনে হবে এটা কোনো হাইস্কুল ছাত্রের রচনা, তা এতই নিকৃষ্ট ছিল। এ ধরনের লেখা ছিল টলস্টয়ের প্রথম প্রচেষ্টার ফসল। তারপর একদা বিশ্বজোড়া খ্যাতিমান লেখক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই লেখার চর্চা সম্মানজনক, আনন্দদায়ক ও নির্দোষ। তোমার কলমের আঁচড়ে তোমার পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হবে না। বরং পাবে অখণ্ড প্রশান্তি। পঠন ও লিখনের মাধ্যমে মানসিক তৃপ্তি মেলে। হৃদয়-মনে শুভ্রতার বীজ অঙ্কুরিত হয়। উন্নত জীবনবোধে লেখক হয়ে পরিব্যাপ্ত। লিখতে নিলে মানুষকে কত যে আপন ভাবা যায়, তা কেবল যারা লেখেন তারাই বুঝতে পারেন। লেখক শুধু লিখে নিজেই আনন্দ পান না, তার লেখা পড়ে অন্যরাও সুখ অনুভব করে। তোমার লেখা যখন অন্যের আনন্দের খোরাক হবে, অপরকে পথের সন্ধান দেবে তখনই তোমার লেখা হবে অর্থবহ। ডাঃ লুৎফর রহমান বলেছেন, জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলে ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা সবই সাহিত্য।

মানুষের কল্যাণের জন্য লিখতে হলে মানুষের স্রষ্টা তথা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক সেই মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তার প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি তোমার লেখায় থাকতে হবে। কেননা যে মেধা-মনন নিয়ে তুমি লিখবে তা কেবল আল্লাহর দান। লেখার উপকরণ-উপজীব্য তাও তিনিই দিয়েছেন। বহমান নদী, সুউচ্চ পর্বতমালা, ঝর্ণার নির্ঝরিনীধারা, বিহঙ্গের সুর, সাগরের বিশাল তরঙ্গরাজি ও দিগন্তে সবুজের হাতছানি– কি নিয়ে লিখবে তুমি বল! প্রকৃতির এত শোভা, এত রূপ এ সবই তো আল্লাহর অনুগ্রহ। এরপর আসে তার সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা। লেখায় এ দুটি বিষয় না এলে সে লেখা খণ্ডিত, সে লেখা অসম্পূর্ণ। তাই তোমার লেখা হতে হবে সৃজনশীল। তোমাকে হতে হবে আত্মোপলব্ধিতে শাণিত।

www.phulkuri.org.bd

প্রজাপতির সাত রঙা ডানায় ভর করে, পার্থিব রূপ রসে সাঁতার দিয়ে ভাবলোকে ডুবে কলম ধরলেই শুধু চলবে না; তোমার লেখায় থাকতে হবে কল্যাণের পরশ, আনন্দের সৌন্দর্য। তোমার মৃত্যুর পরও মানুষ যেন তোমার লেখা ও সাহিত্য কর্মে জীবন চলার আদর্শ, দিক-নির্দেশনা খুঁজে পায়। এখানেই লেখকের সার্থকতা।

মনীষী বার্নাড শ' বলেছেন, All Arts Must be dedactic. অর্থাৎ সব লেখা বা সাহিত্য কর্মকেই সারগর্ভপূর্ণ ও দিক-নির্দেশনামূলক হতে হবে।

আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসী লেখক, কবিদের উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও অনুমোদনে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাসুল (সাঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন আরবের প্রথম শ্রেণীর মেধাবী কবিবৃন্দ। তাদের মধ্যে কবি হাসসান ইবন ছাবিত ছিলেন অন্যতম।

নবীজির (সাঃ) সত্যের দাওয়াত যত সম্প্রসারণ হয়েছে, ইসলামী সাহিত্য ততই বিস্তার লাভ করেছে।

জাতিতে জাতিতে দেশে-দেশে সাহিত্যের ইতিহাস রয়েছে। রয়েছে বৈচিত্র্য। সে সবই আমাদের জানতে হবে। আর জানতে হলে পড়তে হবে। পড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করতে পারলেই লেখার চর্চাটা সহজ হয়ে যায়। টলস্টয়-এর কথায় আবার ফিরে আসি। তিনি বলেছেন, জীবনে তিনটি বস্তুই বিশেষভাবে প্রয়োজন, তা হচ্ছে বই, বই এবং বই।

www.phulkuri.org.bd

গল্প নয় সত্যি

গল্প নয় সত্যি! এ রকম কিছু শুনলেই মনে শিহরণ জাগে। আর গল্পের কথা যদি নিজের জীবনের সঙ্গে মিলে যায় তবে ভালো লাগাটা আরো বেড়ে যায়।

বাগদাদ নগরী। বাদশাহ হারুনর রশীদের স্বপ্নের বাগদাদ। আলো ঝলমলে বাগদাদ। লেখা-পড়ার চর্চা হতো ঘরে ঘরে স্কুল-মাদরাসা গড়ে উঠেছিল সর্বত্রই। বাগদাদের বাদশাহ তখন মালিক শাহ সালজুকী। তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক জ্ঞান চর্চায় ছিলেন খুবই অনুরাগী। তার ইচ্ছে ছিল তিনি কিছু সৎ ও চরিত্রবান ছাত্র গড়ে তুলবেন। এ ছাত্ররা দেশ ও জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখাবে। এ জন্যে বহুদিনের সাধনায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়।

এক রাতে ছাত্রদের অবস্থা দেখার জন্য তিনি বিদেশি বণিকের বেশে বের হলেন। দেখলেন সব হলেই ছাত্রদের কক্ষে বাতি জ্বলছে। ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে। তিনি মনে মনে খুশি হলেন। হয়ত এসব ছাত্রই একদিন দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করবে। একটি কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি সালাম দিলেন। ছাত্ররা তার সালামের জবাব দিল। একজন বিদেশি দেখে ছাত্ররা তাকে ভেতরে ডাকল।

নিজাম-উল-মুলক বললেন, এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রদের ব্যাপারে আমার মনে বড়ই কৌতূহল। বহুদিন থেকে আমি এর খ্যাতি শুনে আসছি। তাই তোমাদের কাছে থেকে আমি একটি কথা জানতে চাই।

ছাত্ররা বললো, আপনি যা জানতে চান বলুন। আমরা ইনশাআল্লাহ সঠিক জবাব দেবো।

–তোমরা এখানে লেখাপড়া করে জীবনে কি হতে চাও।

–আমার পিতা নগর কোতোয়াল। আমি এখানে লেখাপড়া শিখে নগর কোতোয়াল হতে চাই।

www.phulkuri.org.bd

–আমি বিচারপতি হতে চাই।
–আমি একজন বড় চিকিৎসক হতে চাই।
–পরপর তিনজন তাদের অভিপ্রায় জানালো।
প্রধানমন্ত্রী কামরা ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের জীবনের উদ্দেশ্য জেনে নিচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এসে পৌঁছলেন। সেখানে একটি ছোট্ট ছেলে একাই বসে এক মনে লেখাপড়া করছে।
–তুমি অতটুকু ছেলে রাত জেগে পড়াশুনা করছো! তুমি জীবনে কি হতে চাও?
–আমার মা বলেছেন, আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের ওপর তার হক আছে। আমি লেখাপড়া শিখে আল্লাহর সেই হক জানতে চাই এবং তা পুরোপুরি অদায় করার ইচ্ছা রাখি।
–নিজাম-উল-মুলক আনন্দে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।
বললেন, একমাত্র তুমিই আমার আশা পূর্ণ করেছো।
এতক্ষণ সব ছাত্রের আকাঙ্ক্ষা দেখে তিনি হতাশায় ডুবে গিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল এ বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিবেন। এখানে সব লালসার বান্দাহ তৈরি হচ্ছে। একটাও আল্লাহর বান্দা তৈরি হচ্ছে না। কিন্তু ছোট এই ছেলেটিকে দেখে তার মনে আশা জেগেছে। মনে হয়েছে অন্তত একজন আল্লাহর বান্দা তো এখান থেকে তৈরি হবে।
নিজাম-উল-মুলক ছেলেটিকে অনেক দোয়া দিয়ে চলে গেলেন।
তোমরা কি জানো এই ছোট্ট ছেলেটি কে? এই ছোট্ট ছেলেটি হলেন হযরত ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) মুসলিম জাতিকে ইসলামের সঠিক পথে চালাবার জন্য তিনি অনেক সাধনা করে গেছেন।
এবার বল তোমরা আল্লাহর বান্দা হতে চাও না? অবশ্যই চাও। তোমার জীবনের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, তোমার সর্বপ্রথম পরিচয় হবে তুমি একজন মুসলমান। তুমি একজন মুসলমান ডাক্তার হবে। মুসলমান ইঞ্জিনিয়ার হবে। মুসলমান বিচারপতি হবে। নগরীর মেয়র শুধু নগরসভাই পরিচালনা করবেন না, মসজিদে ইমামতি করারও যোগ্যতা রাখবেন।
তবেই কেবলমাত্র আমরা আল্লাহর বান্দাহ হতে পারবো। এই ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির (Concept) উন্নয়ন ঘটাতে হলে আমাদের ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রতিভা নিয়ে কথা

তোমাদের মধ্যে প্রতিভা নিয়ে কথা হয়। প্রতিভা কি। চেষ্টা করলেই প্রতিভাবান হওয়া যায় না। প্রতিভাবান হয়ে জন্মাতে হয়। ইত্যাদি।

মানুষ সৃষ্টির সেরা বুদ্ধিমান জীব। পবিত্র কুরআন শরীফে মানুষকে বলা হয়েছে 'আশরাফুল মাখলুকাত'– অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ সমান নয়। মানুষের তারতম্য নিরূপণের প্রধান মাপকাঠি হচ্ছে বুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতা। এদের পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করেই মানুষের মধ্যে সাধারণ ও অসাধারণত্বের সীমারেখা টানা হয়। যারা অসাধারণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারাই প্রতিভাবান। প্রতিভা একটি বিমূর্ত ধারণা। তাই এক কথায় এর সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। সাধারণ ভাষায় 'প্রতিভা' শব্দের অর্থ হল– সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি। প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের (উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা) অধিকারী হন। তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অপূর্ব প্রজ্ঞার অধিকারীও হন। অনুকূল পরিবেশ প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। প্রতিভাকে উজ্জ্বলভাবে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন হয় সাধনার। সাধনাই প্রতিভাকে দীপ্তি দেয়।

চিন্তা ও মননের উৎকর্ষ, জ্ঞানের সম্ভার, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার দৃঢ়তা নিয়ে যে ব্যক্তি তার কর্ম ক্ষেত্রে সাধনা করে যেতে পারেন, তিনি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সম্ভাবনাময় প্রবণতা লাভ করেন। এ প্রবণতাই প্রতিভা। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ তার বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কৌশল অবলম্বন করে পৃথিবীতে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে আসছে। মেধা ও বুদ্ধির অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। মানুষের এ মেধা জন্মগত না অর্জিত এ নিয়ে বিতর্কের শেষ

www.phulkuri.org.bd

নেই। কারো কারো মতে, প্রতিভা প্রকৃতিগত। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এটা সাধনালব্ধ। প্রকৃতপক্ষে প্রতিভা তৈরি করা যায় না, তা আল্লাহ প্রদত্ত। পৃথিবীর প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকালে সত্যটি বোঝা যাবে। কেননা, যে কেউ ইচ্ছে করলেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শেক্সপিয়র, এরিস্টটল, হোমার বা নিউটন হতে পারেন না। আবার প্রতিভা নিয়ে জন্ম নিলেও একজন মানুষ খ্যাতি অর্জন করতে পারে না। প্রতিভার সাথে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রম নিযুক্ত করলেই তার যথার্থ বিকাশ ঘটে থাকে। আমরা যদি পৃথিবীর সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখব, প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাদের শ্রমলব্ধ সৃষ্টিসম্ভার দিয়ে জগতকে আলোকিত করেন গেছেন।

এসো আমরা এ উপমহাদেশের একজন অসম্ভব প্রতিভাবান ব্যক্তির গল্প করি।

স্কুলের গণিত শিক্ষক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের বলছেন, কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে এক (১) হয়। পাতলা বুদ্ধিদীপ্ত চোখের এক ছাত্র, নাম শ্রীনিবাস রামানুজন হঠাৎ করে শিক্ষককে প্রশ্ন করছেন, 'স্যার, ইজ দ্যাট টু অফ জিরো টু?- অর্থাৎ শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলেও কি উত্তর এক (১) হবে! হতবাক হয়ে শিক্ষক নিজের কথা বন্ধ করে রামানুজনের কথা শুনলেন। এই কিশোর একদিন শুধু ভারতে নয় সারা বিশ্বে অসামান্য গণিতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন। রামানুজনের জীবৎকাল খুব ছোট হলেও তার কাজের পরিধি অল্প সময়ের মধ্যেই এত বিস্তার করেছিল যে, তার ক্ষেত্রে 'জিনিয়াস' আখ্যাটাও যেন একটু কম হয়ে যায়।

তিনি ১৮৮৭ সালে দক্ষিণ ভারতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থেকেই দারিদ্র্য তাড়া করে বেড়িয়েছে, একেবারে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। গণিতের প্রতি তার অদম্য টানও সেই জ্ঞান হওয়া থেকেই। স্কুলের পরীক্ষায় অংকে একশো'য় একশো পেলেও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি কিন্তু তার তেমন আগ্রহ ছিল না।

গণিতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ১৯০৪ সালে যখন তিনি বৃত্তি পান, সেই একই সময় অন্যান্য বিষয়ের জন্য মূল পরীক্ষায় তিনি শেষ পর্যন্ত ফেল করেন।

শ্রীনিবাস রামানুজন কলেজ পরীক্ষায় ফেল করলেও গণিতের ওপর গবেষণা কখনও ছাড়েননি। গবেষণাকালীন সৌভাগ্যবশত তিনি একটি চাকরি পেয়ে যান। তখন থেকেই ইন্ডিয়ান ম্যাথম্যাটিকাল সোসাইটির পত্রিকায় তার গবেষণার কাজ প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালে লন্ডনের ট্রিনিটি কলেজে যান। এবং ক্যামব্রিজে থাকাকালীন গণিতের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তার গবেষণার কাজ প্রকাশ হয়। রামানুজন রয়েল সোসাইটি ও ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় ১৯১৯ সালে ভারতে চলে আসেন।

তার প্রতিদিনের আধাবেলা খাবার ও গবেষণার কাগজপত্রের জন্য টাকার দরকার। এরই সন্ধানে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে চাকরি জুটলেও খাবার বা কাগজপত্র জুটত না। কারণ তার লেখার (গবেষণা) জন্য প্রতিদিন ৭০টি বড় পাতা লাগতো। জীবন যখন ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল, তিনি তখন পাবলিক ডাস্টবিন ও রাস্তা থেকে নীল কালি দিয়ে লেখা কাগজের টুকরো কুড়িয়ে তাতে লাল কালি দিয়ে তার গবেষণার কাজ করতেন।

ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃটিশ গণিতজ্ঞ গডফ্রে হার্ডির সঙ্গে রামানুজন কাজ করতেন। তার কাজ দেখে হার্ডি তাকে প্রতিভাধর হিসেবে চিহ্নিত করেন।

তার সবচেয়ে ভালো লাগত সংখ্যাতত্ত্ব। বিভিন্ন সংখ্যার মধ্যে কি কি সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তার মাথা থেকে অবিশ্রান্তভাবে বেরিয়ে আসত। কেউ কোনো কঠিন অংক জিজ্ঞেস করলে তিনি মুহূর্তে উত্তর বলে দিতেন। সব সময় বলতেন, তিনি স্বপ্নেও অংকের ফর্মুলা দেখেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে সেই সব ফর্মুলা লিখে ফেলেন আর প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।

রামানুজন অল্প বয়সেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কঠিন লড়াই এর শেষে এই স্বনামধন্য ভারতীয় গণিতজ্ঞের জীবনাবসান ঘটে।

www.phulkuri.org.bd

তুমিও পারবে

অংক নিয়ে ভাবনা– আর না আর না।' এ রকম কথা শুনলে তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই খুশি হবে। আসলে এ রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। ভাবনাই যদি না থাকলো, সেটা অংক হতে যাবে কেন? অংক মানেই ভাবনা। চিন্তার ঘষামাজা। অংক মানে একটু বুদ্ধি খাটাও। সমস্যার সমাধান করো, অংকশাস্ত্রে সমস্যার সমাধানে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ও প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। ফলে ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও স্বকীয়তা সৃষ্টিশীল কাজ হয়ে ওঠে। অংকবিদদের কাছে গণিত ভাল লাগার এটা একটা বড় কারণ।

তোমরা চিশ্চয় জানো, গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অবদান অসাধারণ। যে সব মনীষী এ শাস্ত্রে কালজয়ী অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আল-বিরুনী, নাসীরুদ্দীন তুসী, উমার খাইয়াম, আব্দুল্লাহ আল বাত্তানী ও মুসা-খারিযমী প্রমুখ।

আমাদের দেশে রয়েছে, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি। এই কমিটি জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন করে। হ্যাঁ অংক প্রতিযোগিতা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মতই সহজ। বুদ্ধির প্রতিযোগিতা। তুমিও অংশ নিতে পারো অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বলে থাকে 'আমি ইংরেজিতে কাঁচা। অংক ভাল বুঝি না ইত্যাদি। প্রথমে সবাই কাঁচা থাকে। একান্ত মনোযোগ অধ্যবসায় ধীরে ধীরে পোক্ত করে তোলে।

শেরে বাংলা একে ফজলুল হক। বাংলার বাঘকে তোমরা সবাই জানো। তিনি আমাদের জাতীয় চার নেতার অন্যতম। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। তিনি আমাদের গর্ব। তার প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের কথা তোমাদের একটু বলি। তিনি ১৮৯৪ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ

www.phulkuri.org.bd

থেকে গণিত, পদার্থ ও রসায়ন-এ তিন বিষয়ে অনার্স নিয়ে প্রথম বিভাগে বিএ পাস করেন। মুসলমানদের মধ্য তিনি দশম অনার্সধারী ছাত্র। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম তিনিটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে পাস করেন। এরপর একই কলেজে ইংরেজি ভাষায় এমএ ক্লাসে ভর্তি হন। পরীক্ষার মাত্র ছয় মাস বাকি। তাঁর এক হিনদু বন্ধু বললো, মুসলমান ছাত্ররা গণিত নেয় না, কারণ তারা মেধাবী নয়। এ কথা শুনে শেরে বাংলার খুব রাগ হল। ফজলুল হক জিদ ধরলেন তিনি গণিতেই পরীক্ষা দিবেন। যে কথা সেই কাজ। এ সাহস নয়, দুঃসাহস। ইংরেজি পড়া বাদ দিয়ে গণিতের অংক কষতে লাগলেন তিনি। ১৮৯৫ সালে কৃতিত্বের সাথে গণিতে এমএ পাস করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক।

এবার তাহলে সাহসের হাতে হাত রাখ। গভীর মনোযোগ আর অধ্যবসায় তোমাকেও সাফল্য এনে দেবে।

www.phulkuri.org.bd

বিজ্ঞানের হাতছানি

গাছ নিয়ে আমরা ভাবি। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। ছায়া দেয়। ফল দেয়। ঔষধ দেয়। গাছ কত না পরিবেশ বান্ধব। গাছ নিয়ে সার্থক ভাবনা ভেবেছেন আমাদের দেশের কৃতী সন্তান স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন গাছেরও প্রাণ আছে।

১৮৫৯ সালে ৩০ নবেম্বর জগদীশ চন্দ্র বসু মোমেনশাহী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাঢ়ীখাল গ্রামে। তার পিতার নাম ভগবানচন্দ্র বসু ও মাতার নাম বামা সুন্দরী দেবী। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়েছিল ফরিদপুর শহরের এক বিদ্যালয়ে। প্রকৃতির প্রতি তার গভীর আকর্ষণের সূচনা হয় সেখানেই। আর কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর সাহচর্যে বিজ্ঞানের প্রতি তার অসাধারণ আকর্ষণ জন্মে।

বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ভাগ্যচক্রে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ সালে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পাশাপাশি পদার্থ বিদ্যায় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম জীবনে জগদীশ চন্দ্র ইথার-তরঙ্গ এবং বিদ্যুৎ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন। এক পর্যায়ে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের কল্পনা তার চিন্তায় জেগে ওঠে। তিনি সফল হন। এ বিষয়টি ছিল তৎকালীন সময়ের অজানা। তখন আমেরিকায় লজ এবং ইতালিতে মার্কোনি এই দু'জন বিজ্ঞানী বেতারে সংবাদ প্রেরণ বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু এই অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং জনসমক্ষে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলেন, বাংলাদেশের তরুণ বৈজ্ঞানিক

www.phulkuri.org.bd

জগদীশ চন্দ্র বসু। ঠিক সেই সময় তিনি এক বিজ্ঞান সেমিনারে ইংল্যান্ড যান। বেতারের কাজ অর্ধ সমাপ্তি রেখে তাকে চলে যেতে হল। সেই সময় যদি জগদীশ চন্দ্র বসু বেতারযন্ত্র নিজের নামে পেটেন্ট করতেন, তবে মার্কোনির নামের পরিবর্তে বেতার আবিষ্কারক হিসেবে জগদীশ চন্দ্রের নাম উচ্চারিত হতো। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী আজ যশের মালা কণ্ঠে ধারণ করতেন। এ বিষয়টি হয়ত আমরা অনেকেই জানি না।

জগদীশ চন্দ্রের প্রতিভার প্রতি বিশ্বের বিজ্ঞানমহল যথাযথ সম্মান জানিয়ে এসেছেন। শুধু বেতারযন্ত্র নয়, নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ধর্ম বিশ্লেষণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে উত্তেজনাজনিত সাড়ার আবিষ্কার প্রভৃতি তার অবিস্মরণীয় আবিষ্কারগুলোর কয়েকটি।

তিনি 'ক্রেস্কোগ্রাফ' নামে এক অভূতপূর্ব যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। গাছের সংবেদনশীলতা এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। অন্ধকার ঘরে একটা গাছের ওপর আলো ফেলা হল। তারপর গাছকে খাবার দেয়া হল অথবা সামান্য একটু বিষ দেয়া হল অথবা ছোট্ট একটু চিমটি কাটা হল। গাছের ওপরে এসবের ক্রিয়া কি হয় তা চোখে দেখা অসম্ভব। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে গাচের স্পন্দন লেখা হয়ে যায়। তাই দেখে ক্রিয়ার তারতম্য বুঝতে পারা যায়। আবিস্কৃত এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, তরুলতা প্রাণহীন নয়।

জগদীশ চন্দ্র বসু কেবল যে বৈজ্ঞানিক ছিলেন তা নয়, তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন। বাংলাভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি তার অকৃত্রিম আকর্ষণ ছিল। বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তার জীবন ছিল ঘটনাবহুল ও বর্ণাঢ্য।

এই কৃতী বিজ্ঞানীকে নিয়ে, তার আবিষ্কার নিয়ে কথাবার্তার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের একটু জাগিয়ে দেয়া। আজকাল একটি কথা শোনা যায়, বিজ্ঞানে লেখাপড়া করার আগ্রহ কমে যাচ্ছে। অথচ হওয়া উচিত ছিল এর ঠিক বিপরীত। একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের হাতছানিগুলো সত্যিই বড় লোভনীয় বিজ্ঞানের আশীর্বাদে মানুষের জীবন অভাবনীয় রূপে বদলে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে বোঝার পথে, বিশেষ করে নিজেকে বোঝার পথে মানুষ

www.phulkuri.org.bd

অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের, উপলব্ধি করার অবদান রাখার সীমাহীন সুযোগ উন্মুক্ত হচ্ছে পৃথিবীর সকল তরুণের সামনে। এখন কি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার সময়। এই অপরূপ জগতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপগুলো তো হবার কথা অত্যন্ত স্বপ্নভরা, আনন্দময় ও মায়াময়। সেখানে কেন অনীহা আর অবহেলা এসে বাসা বাঁধবে? কিছু ভুল ধারণা, ভুল চিন্তা এই অনাগ্রহের পেছনে দায়ী বলে মনে করা হয়। আর এই ভুল ধারণাগুলো সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশের নিজস্ব কিছু সংকীর্ণ পরিসর ও স্বল্প মেয়াদী বিবেচনা থেকে। এই কম্পিউটার এর কথাই ধর। প্রযুক্তি বা তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে সবার মধ্যে উৎসবের কমতি নেই। কিন্তু মনে করা হচ্ছে এর জন্য খুব বেশি বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই। সরাসরি কম্পিউটার নিয়ে নেমে পড়লেই হল। তরুণরা সরাসরি কম সাধনার পথটি বেছে নিক, সেটি আমাদের কারো কাম্য নয়। সম্ভবও নয়। কেননা এ রকম ভুল ধারণা আমাদের নতুন শতাব্দীর আশ্চার্য সব সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। তাই ছোট্টবেলা থেকেই বিজ্ঞানের যৌক্তিক অনুসরণ, সমস্যা-সমাধান ও প্রাকৃতিক রহস্য উদঘাটনের স্বাভাবিক প্রবণতা আমাদের তরুণদের মধ্যে বিকাশমান হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। বিজ্ঞানের পাঠে অংশগ্রহণ করে এবং তাকে হৃদয়গ্রাহী আনন্দ ও নেশার বিষয়ে পরিণত করেই এটি সম্ভব। আর তা নিশ্চয়ই তোমরা পারবে।

এসো দেশকে ভালোবাসি

জন্মগতভাবেই মানুষের মনে মাতৃভূমির প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মে। স্বদেশের আলো-বাতাস, মাটি, পানি, গাছপালা, শস্য, ফলমূল আমাদের গড়ে তোলে। দেহ-মনের পুষ্টি যোগায়। শিশুকাল থেকেই দেশের মাটির সাথে মানুষের হৃদয়ের যোগাযোগ সূচিত হয়। তাই স্বদেশের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ গড়ে ওঠে। জন্মভূমির প্রতি, দেশের প্রতি এ প্রীতি ও স্নেহের আকর্ষণের আরেক নাম দেশপ্রেম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভূমিকে ভালোবাসতে গিয়ে লিখেছেন–

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থম জনম মা গো তোমায় ভালোবেসে।"

একটি শিশু ছোটবেলা থেকেই দেশকে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখে। ভালোবাসতে শেখে স্বদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশকে। জন্মভূমির নদী-পাহাড়, বন-বনানী, পাখ-পাখালী প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে আপন মনে হয়। এই বোধ থেকেই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গেয়েছেন,

"মধুর চেয়েও আছে মধুর সে আমার এই দেশের মাটি।"

দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে শিশুর মধ্যে স্বদেশের প্রতি কিছুটা দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। বড়দের উচিত শিশুর এই বোধশক্তিকে আরও জাগিয়ে দেয়া। আমাদের দেশে অনেক শিশু-সংগঠন রয়েছে। যারা শিশুদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্রগঠন প্রভৃতি কর্মসূচির মধ্যে একটি অভিন্ন সুর লক্ষ্য করা যায় তা হলো স্বদেশপ্রেম। সকলের একই আহ্বান, এসো দেশকে ভালবাসি। তোমরা জানো, ফুলকুঁড়ি আসরের একটি প্রিয়, স্লোগান–

www.phulkuri.org.bd

"ফুল হয়ে ফুটবো দেশটাকে গড়বো।"

বন্ধুরা! দেশপ্রেম মানবজীবনের একটি শ্রেষ্ঠ গুণ। দেশপ্রেমের মূলে রয়েছে দেশের ভূ-খন্ডকে ভালোবাসা; দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি সৃষ্টি-কালচারকে ভালোবাসা। দেশের জনগণকে ভালোবাসা। দেশের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা রক্ষা করা। নিজেদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে দেশের প্রতি দায়িত্ব পালনের মাধমেই কেবল দেশের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা দেখানো সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সাঃ) তার মাতৃভূমি মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, মক্কার জনগণকে ভালোবাসতেন। কাফিরদের কঠিন ষড়যন্ত্রের কারণে এবং আল্লাহর নির্দেশে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মক্কার দিকে বারবার ফিরে তাকান, আর কাতর কণ্ঠে বলেন–

হে আমার স্বদেশ! তুমি কত সুন্দর! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার আপন স্বজাতি যদি ষড়যন্ত্র না করতো, আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে যেতাম না। রাসুল (সাঃ) বলেন, 'একদিন এক রাতের প্রহরা এক মাসের নফল রোজা ও সারা রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষাও উত্তম। এখানে দেশের সম্পদ ও সীমান্ত প্রহরার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দেশপ্রেম মানুষকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে। দেশের উন্নতি সাধনে সজাগ রাখে। দেশের সম্পদ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করে।

তোমরা যখন বড়ো হবে, উচ্চতর পড়াশোনা করবে তখন দেখবে বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশজুড়ে রয়েছে দেশপ্রেম- স্বদেশ প্রীতি। তার কারণ হলো আমরা জাতি হিসেবে স্বাধীনচেতা। আমরা ইংরেজদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য, লড়াই করেছি। মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য আমরা জীবন দিয়েছি। একাত্তরে স্বাধীনতার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশ আজ বিশ্বের মানচিত্রে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় বন্দি ও নিপীড়িত মানবতার মুক্তির সেই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

"জয় নিপীড়িত প্রাণ
জয় নব অভিযান
জয় নব উত্থান।"

www.phulkuri.org.bd

আমার একটা স্বপ্ন আছে

নতুন বছরে তোমরা নিশ্চয়ই বন্ধুদের Wish করতে ভালোবাস। Happy New Year. মুসলমান বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কৃতির ধারায় বাংলা নববর্ষের ন্যায় ইংরেজি নববর্ষও মিশে আছে একাকার হয়ে নববর্ষ মানেই রূপকথার সেই রূপোর কাঠি। এ দিনটির মর্মস্পর্শে দূরীভূত হয় পুরোনো দিনের সকল জরাজীর্ণতা। নতুনের ছোঁয়ায় রঙিন হয়ে ওঠে ক্লান্ত শ্রান্ত জীবন। নতুন বছরে আমাদের সবার একটা প্রতিশ্রুতি, একটা স্বপ্ন থাকা উচিত।

I have a dream.

আমার একটা স্বপ্ন আছে'– এই উক্তিটি কার জান? মার্টিন লুথার কিং এই মহান উক্তিটি করেছিলেন। তিনি ছিলেন আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। তিনি তার স্বজাতিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। হ্যাঁ আমাদেরও একটা স্বপ্ন আছে। আর সে স্বপ্নটা হলো কবির প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্ন–

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

যার কথা কাজে মিল নেই তাকে কেউ মূল্যায়ন করে না। বড় বড় নীতিকথার ফুলঝুড়ি খুলে পরে যদি সে নিজেই নীতিহীন কাজ করে বসে, তবে সে হয় সবার কাছে ঘৃণিত। নাম, বংশ মর্যাদার বড়াই দেখিয়ে অনেকে বড়ত্ব জাহির করে। আসলে তা হয় মেকি। কাজই মানুষকে বড় করে। সৎ কর্ম ও চারিত্রিক আদর্শের জন্য মহান ব্যক্তিরা স্মরণীয় হয়ে থাকেন। বাবা-মা সন্তানের একটি ভালো নাম রেখে স্বপ্ন দেখেন যেন তার সন্তান নামটির সার্থকতা তুলে ধরতে পারে। তাদের ইচ্ছা তখনই ব্যর্থ হয়

www.phulkuri.org.bd

যখন সন্তান খারাপ কর্ম করে। মানুষ মহৎ কাজ ও গুণাবলী দ্বারা তার নামকে আরও মর্যাদাশীল করে তুলতে পারে।

কবিরা জাতিকে স্বপ্ন দেখান। শামসুর রহমান লিখেছেন, 'বহু দূরের পথ পেরিয়ে, বন পেরিয়ে/এই শহরে আসবে উড়ে/একটি পাখি ভাল।/তার দু'চোখে মায়াপুরির ছায়া আছে,/দূরপাতালের স্বপন আছে,/আছে তারার আলো।"- মানুষের সুখী জীবনের প্রত্যাশাকে কবি এখানে পাখির প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। কবি আল মাহমুদ বলেন, আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে/হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি সারা বাংলাদেশে।/...আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবো না।'– বাংলাদেশের হারানো ঐতিহ্য ও হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধারে কবির আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে। কবির এ স্বপ্ন-সাধ তো শিশুরাই পূরণ করবে। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই শিশুদের জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন এভাবে– "আমি হবো সকাল বেলার পাখি/সবার আগে কুসুমবাগে/উঠবো আমি ডাকি।/ ...আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে/ তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে।"

সত্যিকার অর্থেই শিশুদের জেগে উঠতে হবে। আজকের শিশু আগামী দিনের নাগরিক। দেশ ও জাতির আশা এবং স্বপ্ন হলো বর্তমানের শিশুরা। তোমরা শিশুরা এ স্বপ্ন পূরণ করবে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মাধ্যমে। তোমরা যদি ছোটবেলা থেকেই ঐক্য, সহমর্মিতার দীক্ষা নিতে পারো, প্রকৃত শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারো, আর চরিত্র মাধুর্যে অপরকে বিমুগ্ধ করতে পারো, তবে তোমরা দেশ ও দশের জন্য অনেক কাজ করতে পারবে। তোমাদের কাজ তোমাদের মহিমান্বিত করবে।

নতুন বছরের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। আজ নতুন দিনে এসো আমরা আমাদের সকল বিভেদ ও দ্বিধা দূর করতে সচেষ্ট হই। আমরা জাগ্রত হই অখণ্ড জাতীয় চেতনায়। বর্ষ বরণের মধ্য দিয়ে আমরা সত্য সুন্দর ও কল্যাণকে আহ্বান করি। আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত উচ্চকিত হোক আগামীর গর্বিত প্রেরণায়। বাংলাদেশের সকল শিশুরা ফুলকুঁড়িদের ভাষায় একবার বলে ওঠো- এসো গড়ি পৃথিবীটা সোনালী রঙিন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মশক্তির জাগরণ

এমন একটা সময় ছিলো যখন জ্ঞান অর্জনের পেছনে অর্থ উপার্জনের চিন্তাটা গৌণ ছিলো। ছাত্র-অভিভাবকরা ভাবতো– প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারলে অর্থ এমনি হাতে এসে ধরা দিবে। কেননা জ্ঞানই শক্তি (knowledge is power) বর্তমানে এই বিশ্বাসে হয়তো কিছুটা চির ধরেছে। এখন অনেকেই ভাবে, কোন বিষয় নিয়ে পড়লে বা পড়ালে চাকরির বাজারে ভালো দাম পাওয়া যাবে। তাদের কাছে লেখাপড়ার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই কেউ ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে। কেউবা মেধা থাকার পরও উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করছে না। বিষয়টা এমন দাঁড়িয়েছে যে আমাদের সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য পাস করে চাকরি লাভ করা। এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শুধু শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে দায়ী করা চলে না। আমাদের অভাব-অনটন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থায় যে টানাপোড়েন চলছে এ তারই ফল। তবে অর্থ কিভাবে উপার্জন করা যাবে, এ ক্ষেত্রে জ্ঞানকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়– এ চিন্তা মোটেও দোষের নয়। আবার ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাও জ্ঞানীর কাজ। আমি বলতে চাই জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য যেনো নিরেট অর্থ উপার্জন না হয়। জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারলে অর্থ উপার্জনের পথটি খুলে যায়। এ কথা অনস্বীকার্য যে, জীবনের জন্য অর্থের খুব প্রয়োজন রয়েছে। আবার এই অর্থই সকল অনর্থের মূল। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলা। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। তার রয়েছে নিজস্ব মেধা, সৃজনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি। জ্ঞান মানুষের এসব সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে প্রস্ফুটিত করে। শিক্ষার সংস্পর্শে মানুষ যখন মনুষ্যত্বের আলোয় উদ্ভাসিত

www.phulkuri.org.bd

হয়, তখন সে সব সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে সমাজের মানুষকে ভালোবাসতে পারে। বিনিময়ে সমাজের মানুষও তাকে ভালোবাসা দেয়। এই দুয়ের মাঝে অর্থ-সম্পদের টানাপড়েন আর থাকে না।

জীবনের বিস্তৃত পরিসরে বিপদে-আপদে আনন্দে-উৎসবে সবকিছুতেই অর্থের প্রয়োজন। যিনি জ্ঞানী তিনি অর্থ আয় ও এর সদ্ব্যবহার করতে জানেন। সমাজে অর্থের অপব্যবহার হলে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। তাই জ্ঞান অর্জন বা লেখাপড়ার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন হতে পারে না। আমরা জানি অর্থ ছাড়া পৃথিবীতে একদিনও চলা যায় না। পৃথিবীতে সর্বক্ষেত্রে অর্থের প্রতাপ। টাকা না থাকলে কেউ সম্মান করে না। সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে চাই অর্থ। তারপরও জীবনে এমন কিছু প্রাপ্তি আছে যা অর্থদিয়ে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। তুমি চাইলে অর্থদিয়ে আমোদ-প্রমোদ কিনতে পারবে কিন্তু সুখ নয়। বিছানা কিনতে পারবে কিন্তু নিন্দ্রা নয়। পুস্ত ক কিনতে পারবে কিন্তু প্রজ্ঞা নয়।

যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না তা জ্ঞান দিয়ে সহজেই জয় করা যায়। অর্জন করা যায়। তাই বলি, জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হোক মূল্যবোধ অর্জন। মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব ও আত্মনির্ভরশীলতা, কল্যাণ ও সৌন্দর্য। অনাবিল ভালোবাসা আর আত্মশক্তির জাগরণ।

www.phulkuri.org.bd

তোমাদের কাজের ভার নিতে হবে

আমাদের সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে। তোমরা হয়েতো বলবে ছোটরা কেন দায়িত্বের ভার নেবে। দায়িত্ব পালন করবে তো বড়রা। দায়িত্ব-কর্তব্য কম বেশি সবারই রয়েছে। ছোটদের ছোট কাজের ভার আর বড়দের বড় কাজের দায়– নয় কি?

চরিত্র গঠনের যতগুলো উপাদান রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দায়িত্ববোধ। আসলে দায়িত্ববোধটা কি? তোমাদের ওপর কোনো কাজের ভার ন্যাস্ত করা হলে তা গুরুত্বের সাথে যথাযথভাবে সম্পাদন করার যে তাগিদ বা উপলব্ধি সেটাই দায়িত্ববোধ। এ কাজটি যখন তুমি করবে তখন তোমাকে বলা হবে তুমি দায়িত্ব সচেতন একজন মানুষ। পৌর বিজ্ঞানে নাগরিক দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে। প্রতিটি নাগরিককেই কিছু দায়িত্ব বা কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমনঃ দেশের আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রকে কর দেয়া, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, নিরক্ষরকে অক্ষর জ্ঞান দান করা, সততা ও বিবেচনার সাথে ভোট দেয়া, সরকারি কাজে সহযোগিতা করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা প্রভৃতি নাগরিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

চরিত্রবান লোকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব নেয়ার অর্থ ঝুঁকি নেয়া এবং জবাবদিহির দায় নেয়া। বেশির ভাগ লোকই দায়িত্ব না নিয়ে স্বস্তিতে ঝামেলামুক্ত জীবন যাপন করতে চান। তারা লক্ষ্যহীনভাবে জীবনে এগিয়ে চলেন এবং জীবনে ভালো কিছুর উদ্যোগ নেয়ার চেষ্টা না করে আপনা থেকে ঘটবে এজন্য অপেক্ষা করেন। এটা বোকার স্বপ্ন। দায়িত্ব নিতে হবে বিচার-বিবেচনা করেই; নির্বোধের মতো নয়। ক্লাস ক্যাপ্টেনের (Class Captain) দায়িত্বটা কে নেবে? তোমাদের কাউকে দায়িত্বটা নিতে হবে। তবেই শিক্ষক সুষ্ঠুভাবে পাঠ দিতে পারবেন। তোমরাও তার মাধ্যমে

www.phulkuri.org.bd

শিক্ষককে সহযোগিতা করতে পারবে। দেখনা ক্রিকেট টিমে একজন ক্যাপ্টেন থাকেন। তিনি দলকে জিতিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তোমাকেও ভালো কিছু করতে উদ্যোগ নিতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে। নিজে যখন দায়িত্ব নিবে বিচক্ষণতার সঙ্গেই নিবে। আবার অন্যকে যখন দায়িত্ব দিবে তখনও যোগ্যতা দেখেই দায়িত্ব দিতে হবে। তবেই ফলটা ভালো আসবে। দায়িত্বটা একটা আমানত। তাই ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব নেয়ার অর্থ হলো সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় পরীক্ষা করে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া, কার্যক্রম তৈরি ও সম্পাদন করা। কাজটি সুচারুভাবে সম্পাদিত হলে তুমি নিজেই শুধু উপকৃত হবে না; সংশ্লিষ্ট সকলে তথা সমাজ উপকৃত হবে। বিভিন্ন সময়ে শিশুরা দায়িত্ববোধের ছাপ রেখেছে। সে রকম একটি ইতিহাসের গল্প শোনো–

অনাস। পুরো নাম আনাস বিন মালিক (রাঃ)। কিশোর আনাস অন্য বালকদের সঙ্গে খেলছে। এমন সময় আমাদের প্রিয় নবী রাসুল (সাঃ) সেখানে এলেন। তিনি আনাসকে একটা বিশেষ কাজের জন্য পাঠালেন। আনাস ফিরে না আসা পর্যন্ত রাসুল (সাঃ) তার জন্য ঐ স্থানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এ কারণে আনাসের ঘরে ফিরতে বেশ বিলম্ব হলো। তার মা বিলম্বের কারণ জানতে চাইলেন কোন কাজের জন্য তাকে রাসুল (সাঃ) পাঠিয়েছেন।

আনাস জানালো, রাসুল (সাঃ) কাউকে না জানানোর জন্য বলে দিয়েছেন। এই কথা শুনে তার মা বললেন, রাসুল (সাঃ)-এর এই গোপনীয়তা যেনো চিরদিন বজায় রাখা হয়। আনাস (রাঃ) কোনোদিন কাউকে এ কথা বলেননি। মৃত্যু পর্যন্ত এ কথা গোপন রেখে রাসুল (সাঃ)-এর কথার অমানত রক্ষা করেছিলেন। (বোখারী শরীফ)

George Gritter-এর একটি কথা দিয়ে শেষ করি; যে কর্তব্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয় তা শেষ পর্যন্ত আনন্দের উৎস হয়।

কবি'র প্রত্যাশা পূরণে এগিয়ে এসো

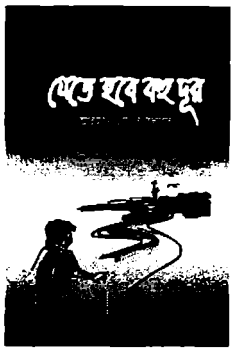

একটি শিশুর জন্ম হলে বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব সবাই আনন্দ করে; কিন্তু শিশুটি কাঁদে। ঠিক তার উল্টোটাই হওয়া উচিত মরণে। কবির ভাষায়–

"প্রথম যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে,
কেঁদেছিলে তুমি একা হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।"

আমাদের আনন্দ হবে এই ভেবে যে, আমরা পৃথিবীতে কিছু অবদান রেখে যাচ্ছি। যে অবস্থায় পৃথিবীকে দেখেছিলাম, তার থেকে ভালো অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। সবাই এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করুক যে, পৃথিবী একটি সৎ মানুষকে হারিয়ে দরিদ্রতর হয়ে গেছে। তবেই সার্থক জনম।

নদীতে ডুবে যেতে যেতে একটি বালক চিৎকার করে সাহায্য চাইলো। এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নদীতে ঝাঁপিয়ে বালকটির প্রাণ বাঁচালেন। তারপর যখন ভদ্রলোক চলে যাচ্ছিলেন তখন বালকটি বললো, "ধন্যবাদ"। ভদ্রলোক বললেন, "কিসের জন্য?" বালকটি বললো, "আমার জীবন রক্ষা করার জন্য।" ভদ্রলোকটি বালকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাবা! তুমি যখন বড়ো হবে তখন তোমার জীবন এমনভাবে গড়ে তুলবে যেন মনে হয় তোমার জীবন বাঁচাবার উপযুক্ত ছিল।"

মানুষ তার নিজের ধারণা ও চিন্তার মধ্যেই বেড়ে ওঠে। তার বাইরে যেতে পারে না। একটি শিশু তার নিজের সম্পর্কে ধারণা যতো ভালো হবে, চিন্তা যতো পরিশীলিত হবে তার জীবন ততো উন্নত ও সুন্দর হবে। শিশুর এই উন্নত ধারণা বা আত্মমর্যাদাবোধ বিনির্মাণে পরিবার-পরিবেশের ব্যাপক

www.phulkuri.org.bd

ভূমিকা রয়েছে। আমরা পরিবেশ থেকেই শিখি। ভালো-মন্দ দু'ভাবেই প্রভাবিত হই।

শিশু যদি কেবল নিন্দা শুনতে শুনতে বড়ো হয়, তবে সে নিন্দা-মন্দ করতেই শিখবে। আবার যদি প্রশংসা শুনে বড়ো হয়, তবে প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে শিখবে। যদি সে বেড়ে ওঠে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে, তবে তার লড়াই করার শক্তি বেড়ে যাবে। আর যদি তার পরিবার হয় সহনশীল, সেও হয়ে উঠবে ধৈর্যশীল। শৈশব থেকে যদি কেবল উপহাস পায়, তবে সে হবে লাজুক। আর যদি পেয়ে থাকে ক্রমাগত উৎসাহ, তবে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। যদি পায় সকলের সমর্থন, তবে নিজের উপরে আস্থা রাখতে পারবে। শৈশবে যদি সুবিচার পায়, তবে সে ন্যায়বিচার করতে শিখবে। নিরাপত্তার মধ্যে বাস করলে সে শিখবে বিশ্বাস করতে। শিশু যদি পায় বন্ধুত্ব ও স্বীকৃতি, তবে সে পৃথিবীতে ভালোবাসার সন্ধান করবে। পরিবেশই এভাবে একটি শিশুর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের বীজ বপণ করে। এই ভিত্তি বীজ থেকেই অঙ্কুরিত হবে মানবজীবন নামের সবুজ উদ্ভিদ। যা এক সময় ফুলে ফুলে বিকশিত হবে। এই বিকাশমানতা এমনি-এমনি হয় না। এ জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা, অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলাবোধের দীক্ষা।

আজকে তোমরা যারা শিশু তারা আগামী দিনের নাগরিক। তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ। তোমরা একদিন ফুলের মতো বিকশিত হবে। গড়ে উঠবে আদর্শ মানুষ হিসেবে। পূরণ করবে কবির প্রত্যাশা।

সত্য ও সুন্দরের পথে এসো

সকল মহল থেকেই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হচ্ছে। তোমরা প্রশ্ন করবে নৈতিক শিক্ষা কি?

ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্য-অকর্তব্য বিচারই নৈতিক শিক্ষার মূল কথা। নীতি বলতে ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত বিষয়কে বুঝানো হয়। ভালো ও কল্যাণের সীমা বলে দেয় নীতি-জ্ঞান বা নৈতিক শিক্ষা।

নীতিজ্ঞান থেকে জন্ম নেয় নৈতিকতা। নীতিকথার উৎস ধর্ম। তাবৎ হিতোপদেশ এসেছে ধর্মীয় চিন্তা থেকে। আর ধর্মচিন্তার উৎস আসমানী কিতাব। আমাদের সমাজজীবনে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক তথা ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত। অথচ একজন ব্যক্তিকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করতে ধর্মই নীতিজ্ঞান ও নৈতিক শক্তির যোগান দেয়। যেমন সর্বদা সত্য কথা বলবে। আমানতের খেয়ানত করবে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না। অসহায়ের সহায় হবে। ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে। বড়কে সম্মান করবে, ছোটদের আদর করবে। সমবয়সীদের ভালোবাসবে। এ ধরনের নীতিবাক্যগুলোর উৎস ধর্ম।

আমাদের দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল-কলেজ লেখাপড়ায় ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ সীমিত। প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত তোমরা ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি পড়ে থাকো। এ বিষয়টি শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য না পড়ে, তা বাস্তব জীবনে আমলের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়ো। তবে এ থেকে একটা ভালো ফল তোমরা পেতে পারো।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন শিক্ষা-দীক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিকমূল্যবোধ জাগ্রত হবে। নৈতিক শিক্ষার বড় পাঠ সততা।

www.phulkuri.org.bd

সততা মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ। এ গুণটি মানবজীবনকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। এ গুণের বলে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জনে সক্ষম হয়। মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় নৈতিক গুণে। আর এ নৈতিক গুণগুলোর সমন্বিত রূপই হচ্ছে সততা। সততা জীবনকে আলোকিত ও মহিমান্বিত করে তোলে। সততা আসলে কোনো একক গুণ নয়। অনেকগুলো গুণের সমষ্টি। এসব গুণের মধ্যে আছে সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, স্পষ্টবাদিতা, সদাচার প্রভৃতি। কোনো অন্যায় বা অবৈধ কাজ না করার নামই সততা। সততা বলতে সত্যের অনুসারী মানুষের সৎ থাকার প্রবণতাকে বুঝায়। সততা মানবজীবনকে করে মহিমান্বিত। কবি শেখ সা'দী বলেন, 'সততা জীবনের আলো, সততা শ্রেষ্ঠ ভালো, দিকভ্রান্ত অসততা, কালজয়ী সততা।' বহুল প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে– 'Honesty is the best policy' অর্থাৎ সততাই সর্বোত্তম পন্থা।

বিশ্বসংসারে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সবচেয়ে সত্য যে কথাটি তা হলো, 'সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত।' সত্য-সততা মানুষকে আলোকিত করে। মিথ্যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সত্য শান্তি ও সুন্দরেরর ধারক। মিথ্যা অশান্তির বাহক। একটি সত্য গোপন করতে দশটি মিথ্যা বলতে হয়। তাই মিথ্যা হৃদয়কে কলুষিত করে। আমাদের দেশে সৎ মানুষ বলতে ঝুঝায় কোন অসৎ কাজ না করা। প্রকৃতপক্ষে সততা আরো ব্যাপক বিষয়। নিজে শুধু অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাই সততা নয়। আমাদের চারপাশে যাতে অসৎ কাজ অসুন্দর কাজ না হতে পারে সেজন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করা সততার দাবি। অন্যায় অসুন্দরের মোকাবেলা, প্রতিবাদী না হলে সৎ মানুষের প্রকৃত মর্যাদা আমরা পাবো না।

www.phulkuri.org.bd

একটু মিষ্টি করে হাসো

দার্শনিক এরিস্টটলকে সমসাময়িক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর স্বীকৃতি দেয়া হলে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন, 'তিনি এ টুকুই জানেন যে, তিনি কিছুই জানেন না।' –এরিস্টটলের এ বিনয় তুলনাহীন, অনবদ্য। এই অভিব্যক্তির প্রকাশকেই হয়ত বা শিষ্টাচর বলা হয়।

তোমরা হয়ত শিষ্টাচার কথাটির সাথে কমবেশি পরিচিত। শিষ্টাচর অর্থ শিষ্ট বা মার্জিত আচরণ। মানুষের কথায়, আচরণে, চালচলনে যে ভদ্রভাব, সৌজন্যবোধ ও শালীনতার পরিচয় পাওয়া যায় তাই সামগ্রিক অর্থে 'শিষ্টাচার' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

অনুপম আচরণ মহাত্ম্য-ভদ্রতা, বিনয়, পরিচ্ছন্নতা-পবিত্রতা, সদবিবেচনা-উত্তম নির্বাচন, সুবিন্যস্ত শৃঙ্খলা, রুচির সৌন্দর্য প্রিয়তা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহানুভূতি-মঙ্গল কামনা, ধৈর্য-সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা- এ সবই শিষ্টাচার লালনকারী সংস্কৃতিবোধ থেকে উৎসারিত। যার চর্চা জীবনকে করে সুন্দর ও উজ্জ্বল। মানুষের জীবনের সুষ্ঠু ও সুন্দর বিকাশের জন্য শিষ্টাচার এক অপরিহার্য গুণ। সমাজের অন্য দশজনের থেকে ভদ্র ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তার শিষ্টাচারের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। শিষ্টাচার মানবচরিত্রের অলংকার, জীবনে মর্যাদা ও সম্মান লাভের প্রধান উপায়। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত শিক্ষা ও মূল্যবোধের সামাজিক প্রকাশ ঘটে শিষ্টাচারের মাধ্যমে। শিষ্টাচার মানুষকে সাধারণ থেকে বিশিষ্ট করে তোলে।

একটি শিশু শিষ্টাচারের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে পরিবারে। বড়রা কিভাবে একটি টেলিফোন কল রিসিভ করছে; কিভাবে অতিথিকে অভ্যর্থনা

www.phulkuri.org.bd

জানাচ্ছে এবং অন্যের আনন্দে সুখি হওয়া অথবা দুঃখে সান্ত্বনা জানানোর অভিব্যক্তির প্রকাশ কিভাবে ঘটছে শিশুরা তা দেখে দেখে শেখে। একটি পরিবারের সদস্যদের আচরণ যত পরিশীলিত হবে সেই পরিবারের শিশুদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ততো মর্জিত হবে। ইংরেজিতে একটি কথা আছে Environment Makes a man perfect তাই সমাজ জীবনে শিষ্টাচারের লালনে পরিবারের পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষ সামাজিক জীব। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাকে সমাজবদ্ধভাবে এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হয়। প্রতিদিন বহু ব্যাপারে মানুষকে পরস্পরের সাথে মিলেমিশে চলতে হয়। অপরের সুবিধা-অসুবিধা মতামত ও অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখাতে হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, শিষ্টাচার ব্যক্তিগত গুণ হলেও সমাজের সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক হয়েছে। শিষ্টাচার মানুষকে ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে বিনয় শেখায়। হিংসার পরিবর্তে প্রীতি শেখায়। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা রুচিলীলতা চারিত্রিক আভিজাত্য শিষ্টাচারে মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। কেউ যদি অভদ্র আচরণ করে তবে সে স্বভাবতই সকলের বিরাগ-ভাজন হয়। এবং ব্যক্তিগতভাবে নিজের জীবনের সাফল্যকে বিঘ্নিত করে।

তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে, প্রত্যেক মানুষের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার কথাবার্তা এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে শিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। বদমেজাজি লোকের সাথে কথা বললে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়। দুর্বিনীত লোক হেঁটে চলার সময় তার ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়। বেশভূষার ধরণ দেখেও বোঝা যায়, লোকটি ভদ্র কি না।

আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, কারো সাথে দেখা হলে একটু মিষ্টি করে হাসা উত্তম ছদকা।'

এই একটু হাসির চুম্বক ক্ষমতা রয়েছে যা হৃদয় স্পর্শ করে। মার্জিত আচরণের গুণে অন্যের হৃদয়ে খুব সহজেই জায়গা করে নেয়া যায়। এমন কি একটু ভালোবাসা, মিষ্টি কথা ও সংযমী আচরণ দিয়ে শত্রুর মনও জয় করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তিও শিষ্টাচরের সাহায্যে সকলের ভালোবাসা লাভ করতে পারে।

www.phulkuri.org.bd

সত্য বলার সাথে শিষ্টাচারের কোনো বিরোধ নেই। অনেকে মনে করেন, সত্য প্রকাশের জন্য অন্যের মনে আঘাত দেয়ায় কোনো দোষ নেই। কথাটি ঠিক নয়। সত্যকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে; সেজন্য খারাপ আচরণের প্রয়োজন নেই। বরং মধুর বাক্যে, বিনীতভাবে তিক্ত হলেও সত্য কথাটি প্রকাশ করতে হবে। এতে বক্তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। অপ্রিয় সত্যকেও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়।

শিষ্টচারী হবার জন্য মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষাই মানুষকে ভদ্র ও বিনয়ী করে তোলে। গৃহের সুন্দর পরিবেশে পিতামাতা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে তোমরা শিশুরা শিষ্টাচার লাভ করতে পারো। সকুল-কলেজের শিক্ষাজীবনেও শিক্ষক বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকেও তা শেখার সুযোগ রয়েছে। তোমাদের সমাজের সীমানায় চারপাশের পরিবেশের প্রভাবে এ গুণের বিকাশ ঘটাতে হবে।

ইংরেজি ভাষায় শিষ্টাচারমূলক অনেক শব্দ ও বাক্যের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আমরা আমাদের ভাষার মধ্যে অনেক সময় সে সব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে থাকি। শিষ্টাচারমূলক ভাব প্রকাশে বাংলা ভাষাও কম সমৃদ্ধ নয়। আমাদের উচিত শিষ্টাচারমূলক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা শব্দ-বাক্যের ব্যবহার ও চর্চা করা। তাহলে ছোট-বড়, শিক্ষিত-স্বল্প শিক্ষিত সবার ওপর এর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। যেমন- কারো সাথে দেখা হলে হাসিমুখে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করবে। একান্ত প্রীতিভাজন কেউ হলে আরও বলতে পারো– তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। ইংরেজিতে কথাটি এভাবে বলা হয়: I am glad to see you. তোমার বন্ধুটিও বলতে পারে– আমিও কম খুশি নই। (The Pleasure is mine.)

প্রথম পরিচয়ে বা বড়দের কারো নাম জানতে চাইলে সরাসরি জিজ্ঞেস না করে এভাবে বলো: –আপনার নাম জানতে পারি? অথবা দয়া করে আপনার নামটা একটু বলবেন?

(May I know your name Please.)

www.phulkuri.org.bd

সামাজিক জীবনে পারস্পারিক দেখা-সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে আমরা এভাবে ভাষার ব্যবহারে শিষ্টাচারের প্রকাশ ঘটাতে পারি।

কথাবার্তায় বিনয় ভাব প্রকাশ ছাড়া নীরবেও আমরা ভদ্রতা ও উদারতা দেখাতে পারি। কোনো অনুষ্ঠানে বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো ব্যক্তিকে তুমি নিজে আসন ছেড়ে বসতে বলতে পারো। কোনো কাজে অপরকে অগ্রাধিকার দিতে পারো। এভাবেও নিজের চরিত্রের মাধুর্য ফুটিয়ে তোলা যায়। শুধু এতটুকুই শিষ্টাচারের পরিধি নয়। শিষ্টাচার একটি সামগ্রিক ধারণা। ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে মানুষ তার সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে স্থান করে নেয়ার যে মানসিক প্রবণতা বা ইচ্ছার প্রকাশ তাই শিষ্টাচর। তাই তোমাদের শৈশব থেকেই আত্মসংযম ও মার্জিত রুচির অনুশীলন করতে হবে। শান্ত গৃহকোণে, কল-কাকলিমুখর শিক্ষায়তনে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ হবার সুযোগটি তোমাদের খুঁজে নিতে হবে। তবেই দেখবে একদিন তুমি সকলের প্রিয় মানুষ হয়ে উঠবে। তুমি হবে আলোকিত মানুষ।

www.amarboi.org

কথা দিয়ে কথা রাখবো...

প্রতিটি ধর্মই চায় মানুষকে নিয়মের বাঁধনে বাধতে। চায় নৈতিক শক্তিতে উজ্জীবিত করতে। যারা ধর্ম-কর্ম মানতে চান না। যারা বলেন, মানবল্যাণই বড় ধর্ম। তারা মানবীয় গুণাবলীর দ্বারা পরিচালিত হন। তারা ধর্মকে অস্বীকার করলেও নীতিশাস্ত্রকে উপেক্ষা করতে পারেন না। কেননা মানবীয় গুণাবলী আর নীতি কথা মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। প্রকান্তরে তারা ধর্মকেই মানেন। তাই আদর্শ চরিত্র গঠনে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন করতে হবে-এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা নৈতিক শিক্ষার উপাদানগুলোর মধ্যে সততা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছি, সততা আসলে কোনো একক গুণ নয়। অনেকগুলো গুণের সমষ্টি। আমরা ইতোমধ্যেই সত্যবাদিতা শালীনতা নিয়ে কথা বলেছি। আমরা ওয়াদা পালন ও আমানত রক্ষা নিয়ে কিছু কথা বলব। ওয়াদা পালন : ওয়াদা অর্থ প্রতিশ্রুতি (Commitment)। ওয়াদা পালন করা মানে কথা দিয়ে কথা রাখা। কথা মতো কাজ করা; চুক্তি রক্ষা করা যে কথা বলা হবে সেই কথা অনুযায়ী কাজ করা। কাউকে প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দিলে তা রক্ষা করা। কারও সাথে কোনো চুক্তি করলে তা ভঙ্গ না করা। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলছেন, ওয়াদা এক ধরনের ঋণ। অর্থাৎ কারও নিকট থেকে ঋণ নিলে যেমন পরিশোধ করতে হয় তেমনি কারও সাথে ওয়াদা করলে তা পূরণ করতে হয়।

ওয়াদা পালনকারী সমাজে সম্মানের পাত্র। সকলে তাকে বিশ্বাস করে ও ভালো জানে। তার সাথে লেনদেন করতে আগ্রহী হয়। অভাব-অনটনে পড়লে তাকে সাহায্য করে। ফলে তার জীবন হয় সুনামের ও সুখময়।

অপরদিকে ওয়াদা ভঙ্গ করা একটি মারাত্মক অপরাধ। যে ওয়াদা পালন করে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। বিপদে পড়লে কোনো লোকই তার

www.amarboi.org

সাহায্যে এগিয়ে আসে না। তার জীবন হয়ে ওঠে বিষাদময়। ওয়াদা রক্ষা করা, না করার ব্যাপারে তুমিও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারো। তুমি হয়তো বন্ধুকে কথা দিয়েছ, খেলার মাঠে দেখা করবে; আর গেলে না। সহপাঠীর কাছ থেকে গল্পের বই এনেছো নির্দিষ্ট তারিখে ফেরৎ দেবে বলে। কিন্তু দিলে না। শিক্ষকের কাছে প্রমিজ করেছো, ক্লাসের পড়া তৈরি করে যাবে। কিন্তু তা আর করলে না। এভাবে তোমাদেরও কিন্তু ওয়াদা রক্ষা করা বা ভঙ্গ করার ঘটনাগুলো অজান্তেই অহরহ ঘটে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। যে কোনো মূল্যে ওয়াদা রক্ষা করতে হবে।

আমানত রক্ষা : আমানত হল গচ্ছিত রাখা। কারও টাকা-পয়সা বা মূল্যবান জিনিস গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়। যে গচ্ছিত সম্পদ স্বযত্নে রেখে মালিকের কাছে ফেরৎ দেয় তাকে আমানতদার বলে। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যার অর্থ বা সম্পদ গচ্ছিত রাখার কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা নেই; সে কি করবে? নিশ্চয়ই কোনো সৎ মানুষের কাছে তার সম্পদ গচ্ছিত বা আমানত রাখবে। তোমরা একদিন বড় হবে, প্রতিষ্ঠা পাবে। সেদিন হয়তো তোমাকেও এমন দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাড়ির কাজের লোকটির কথাই ভাবো! ওর উপার্জিত টাকাটা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারে। তখন তোমাদের আমানতদার হতে হবে। যথাসময়ে চাওয়ামাত্র তার টাকা তাকে ফেরৎ দিতে হবে। তবেই আমানত রক্ষা করা হবে।

আমানতের ধারণা আরেকটু ব্যাপক। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব তার কাছে পবিত্র আমানত। সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আমানত। তাদের লালন-পালন ও সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠন শিক্ষকদের নিকট পবিত্র আমানত। আবার পিতামাতা বা শিক্ষকদের দেয়া কোনো দায়িত্ব বা কাজ তোমাদের নিকট বড় আমানত। দেশের সম্পদ জনগণের হাতে আমানত। দেশের সরকারের কাছে সমগ্র দেশ আমানত।

আমানতের মাল আত্মসাৎ করাকে খিয়ানত বলে। খেয়ানত করা খুবই খারাপ ও গর্হিত কাজ এবং খারাপ অপরাধ।

আমরা সতর্কতার সাথে ওয়াদা পালন করবো। আমানতের গুরুত্ব উপলব্ধি করবো। জীবনে সকল ক্ষেত্রে আমানতদার হবো।

www.amarboi.org

সততা স্থায়ী সাফল্য এনে দেয়

ইংরেজিতে একটি কথা আছে Honesty is the best policy অর্থাৎ সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সততা মানুষের এমন একটি গুণ যা তাকে স্থায়ী সাফল্য এনে দেয়। একজন মানুষ যদি সৎ ও ন্যায়-নিষ্ঠ হয় এবং মানব কল্যাণের জন্য অবদান রেখে যায়, তবে সে মরেও অমর হয়ে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকে। যুগে যুগে লোকে তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। সততা একটি সমন্বিত গুণ। ব্যক্তিগত ও জাতীয় যে কোনো অর্জনের দিকে এগিয়ে যেতে সততা একটি অবিকল্প পছন্দ। জগতের মহামানবদের দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পেছনে রয়েছে সততা।

সৎ পথটা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেখানে পদে পদে থাকে দুঃখ-বিপত্তি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সততারই জয় হয়। এ জন্য ব্যক্তিগত পর্যায় ছাড়া জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের জন্যও প্রয়োজন সততার। যে জাতি যত বেশি সৎপথ থেকে বিচ্যুত সে জাতি তত বেশি অনুন্নত।

এখানে একটি কথা বলবো, শুধু সৎ হলেই চলবে না। তার সঙ্গে যোগ্যতা তথা প্রতিভার সমন্বয় ঘটাতে হবে। সৎলোক যদি অযোগ্য হয়, সে আলো ছড়াতে পারে না। আবার প্রতিভাবান ব্যক্তিটি যদি অসৎ হয় তবে সে সমাজের অকল্যাণ ডেকে আনে। তাই সৎপ্রতিভা মানুষের জীবনে আত্মবোধের শক্তি সঞ্চার করে, যা সৃষ্টিশীল ও মননশীলতায় উদ্ভাসিত হয়ে জীবনকে ভারসাম্য ও সজীব করে। ফলে মানুষ হয়ে ওঠে খ্যাত-বিখ্যাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তার বিচরণ হয় অবাধ, উৎকর্ষে সে অর্জন করে শ্রেষ্ঠত্ব। বস্তুত সৎ মানুষের প্রতিভা এমন জিনিস, এটি যাকে স্পর্শ

www.amarboi.org

করে তাকে সজীব করে। প্রাণবন্ত করে। একজন সৎ প্রতিভাবান মানুষের গল্প করি এসো।

হ্যানিম্যানের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। মহাত্মা হ্যানিম্যান হলেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক। তিনি ব্যক্তি ও পেশাগত জীবনে ছিলেন খুবই সৎ ও প্রতিভাবান। সততার প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা। এজন্য তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়। শেষে সৎপথই তাকে চিরন্তন সেই পথের সন্ধান দেয়। তিনি উন্মোচন করেন, বিজ্ঞানের এক নবদিগন্ত।

জার্মানীর অন্তর্গত ড্রেসডনের নিকটবর্তী মাইসেন নগরে হ্যামিম্যান জন্মগ্রহণ করেন। সময়টা ছিল ১৭৫৫ খৃস্টাব্দের ১০ এপ্রিল। তার পুরো নাম ফেডারিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান। তার দরিদ্র চিন্তাশীল পিতা শৈশবে তাকে সেই শিক্ষাই দিলেন, যার ফলে সকল ক্ষেত্রে সৎ চিন্তা ও পবিত্র ভাবের অঙ্কুরোদগম সম্ভব হয়। কার্যত: পিতৃ প্রদত্ত সুশিক্ষা ও সদুপদেশ তাঁর ভবিষ্যত জীবনের গভীর ধ্যান, ধারণা ও গবেষণার ভিত্তি রচনা করে। পিতা হ্যানিম্যানের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেননি। তবে বালকটির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও বিদ্যালাভের বিপুল পিপাসা লক্ষ্য করে তার স্কুলশিক্ষক উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে হ্যানিম্যান ১৭৭৫ সালের প্রথম দিকে 'লিপজিক' গমন করেন। সেখানে চরম অর্থাভাবে পড়েন। ডাক্তারি শিক্ষায় ব্যয় নির্বাহ করতে জার্মান ও ফরাসী ভাষায় শিক্ষকতা ও ইংরেজি পুস্তক অনুবাদ করতে বাধ্য হন। এরূপ অনেক বাধা অতিক্রম করে ১৭৭৯ সালে তিনি এলোপ্যাথিক, চিকিৎসাশাস্ত্রে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রাচীন বা আধুনিক প্রায় সকল ভাষাই তিনি জানতেন। প্রাচীন বা সমকালীন সকল চিকিৎসামূলক সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল সুনিবিড়।

অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন নামকরা বড় চিকিৎসক, শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক গবেষক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তারপরও তার মন তৃপ্ত ছিল না। অগাধ জ্ঞান প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের সঙ্গতি সম্পর্কে বিচার করার তার যোগ্যতার ভিত্তি রচনা করে। তার সূক্ষ্ম বিচারে

www.amarboi.org

তৎকালীন চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক দোষত্রুটি ধরা পড়ে। তিনি লক্ষ্য করলেন, প্রকৃতির নিয়ম-নীতির সঙ্গে প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের বৈসাদৃশ। তিনি হতাশ হলেন। এরূপ পদ্ধতিতে চিকিৎসা কার্য চালিয়ে যেতে তার বিবেকে বাধ সাধলো। তাই তিনি চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ রেখে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থাদির অনুবাদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। এরপর অনেক দিন কেটে গেল। ১৭৯০ সালের দিকে তিনি ডা. কালেন-এর একটি বই অনুবাদ করছিলেন। এক জায়গায় লক্ষ্য করলেন, ভেষজ উদ্ভিদ 'সিঙ্কোনা'র রোগ সৃষ্টিকারী ও রোগ আরোগ্যকারী ক্ষমতা রয়েছে। তার চিন্তার জগতে ঢেউ জাগল। তিনি এই সূত্র ধরে অবিরাম চিন্তন, পরীক্ষণ ও বাস্তব প্রয়োগ চালাতে থাকেন। দীর্ঘ ছয় বছর পর তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেন।

তার প্রমাণিত মতবাদের সার নির্যাস হল, "প্রত্যেক শক্তিশালী ভেষজ দ্রব্য মানবদেহে এক কৃত্রিম রোগের সৃষ্টি করে। ভেষজটি স্থূল আকারে যত বেশি প্রয়োগ করা যাবে, রোগটি তত প্রবল হবে। আবার এই ভেষজটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম মাত্রায় প্রয়োগ করলে রোগ লক্ষণটি দুরীভূত হবে।

হ্যানিম্যান তার আবিষ্কৃত এই তত্ত্বের উপর তৎকালীন হাফল্যান্ডের জার্নালে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধই হোমিওপ্যাথির জন্মের সূচনা করে।

তার এই আবিষ্কার চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নবযুগের উন্মেষ ঘটায়। মাহাত্মা হ্যানিম্যানের আবিষ্কৃত হোমিপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি আজো মানবতার কল্যাণে নিবেদিত হয়ে আসছে। বস্তুর সূক্ষ্মতম শক্তি দর্শনে অভিভূত হ্যামিম্যান হয়ত জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই শেষ জীবনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার মুসলমান হবার খবর তৎকালীন খৃস্টান সমাজ গোপন রেখেছিল। সাম্প্রতিককালে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে তার ইসলাম গ্রহণের কথাটি জানা যায়।

হ্যানিম্যান তার কাজের জন্য আজো স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছেন। তার জীবন ও কর্ম প্রয়াস নিশ্চয়ই আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

www.amarboi.org

মাকে ভালবাসো

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে...'। এমন সুর যেন শুধু কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে। 'মা' পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম (SWEETEST) শব্দ। মাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। এ ভালবাসায় কোন খাদ নেই। তারপরও এই জীবনসংসারে মাকে আমরা সত্যিকার অর্থে কতটুকু ভালোবাসতে পারি। এমন একটা প্রশ্ন হয়ত থেকেই যায়।

মা-নারী জাতির মূর্ত প্রতীক। একজন নারী পূর্ণতা লাভ করে মাতৃত্বে। মাকে ভালোবাসার আরেক অর্থ নারীর প্রতি সম্মান দেখানো। আজকে কি আমরা মাকে সত্যিকার ভালোবাসতে পারছি? নারীর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে পারছি?

ইসলাম আগমনের আগে নারীর কোনো সম্মান ছিল না। নারীত্বের অবমাননা করা হত। ইসলাম এই অভিশাপ থেকে নারী জাতিকে মুক্তি দেয়। নারীর মর্যাদাকে উচ্চকিত করে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাহাবীদের এক বৈঠকে আলোচনা রাখছিলেন। এমন সময় একজন ভদ্র মহিলা সেখানে আসলেন। রাসুল (সাঃ) উঠে গিয়ে তাঁকে সালাম জানালেন এবং নিজের গায়ের গেলাফ মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে তাকে বসতে বললেন। সাহাবীরা অদূরে বসে দেখছেন। ভাবছেন, কে এই সৌভাগ্যবান নারী যে বিশ্বনবীর (সাঃ) গায়ের চাদরে বসার স্পর্ধা দেখাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর আগন্তুককে বিদায় দিয়ে নবীজী (সাঃ) ফিরে এলেন মজলিসে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী কে এই মহিয়সী নারী? নবীজী (সাঃ) বললেন, উনি আমার দুধ মা বিবি হালিমা।

www.amarboi.org

মায়ের প্রতি ভালোবাসা, নারীর প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের এর চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ আর কি হতে পারে।

মা শিশুর প্রথম আস্থাভাজন একজন মানুষ। ভালোবাসার আধার। প্রথম শিক্ষক। তাই বলা হয় মমতাময়ী মা। ছোটবেলায় সন্তান মাকে কত না জ্বালাতন করে। মা আদর দিয়ে স্নেহের সন্তানকে আগলে রাখেন। একটু কাঁটার আচড় লাগতে দেন না। সন্তানের পরিচর্যা, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিপাটি করে রাখা, সঠিক সময়ে খাওয়ানো ও লেখাপড়ার আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে মায়ের তুলনা হয় না। এক কথায় মা সন্তানকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে ভিত্তিমূলের (Foundation) কাজটি করেন। এই সন্তানই যখন বড় হয় তখন সে তার অতীত ভুলতে বসে। তারপর সে যখন নিজে বাবা-মা হয় তখন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। ততক্ষণে হয়ত বাবা-মাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়ে গেছে। সংসারজীবনের বাস্তবতা এত কঠিন যে, সে চাইলেও আর সব সময় বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। বাবা-মা কোনো সময় ভালোবাসার প্রতিদান চান না। বাবা-মার সন্তুষ্টির মধ্যেই সন্তানের সফলতা নিহিত। হাদিস শরীরে এসেছে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহশত। আরো বলা হয়েছে, 'তোমাদের পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন তাদের সঙ্গে এমন আচরণ করো না যাতে তারা উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করে।'

ইসলামের এই সুমহান আদর্শই আমাদের পরিবার প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছে। এ জন্যই আমরা বড়কে সম্মান করি, ছোটকে স্নেহ করি। একে অপরের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হই।

শিশু বায়জিদ এর ঘটনাটি তোমরা জান। মা পানি চাওয়ায় সে কলসী থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে নিয়ে মায়ের শিয়রে উপস্থিত হলো। কিন্তু এরই মধ্যে মা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বালক বায়জিদ কি করবে ভেবে পেল না। মায়ের ঘুম ভাঙাতে গেলে তার কষ্ট হয়। পানির গ্লাস রেখে দিলে যদি তিনি উঠে পানি না পান। তাই সে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে রইল। গভীর রাতে মায়ের ঘুম ভাঙল। তিনি দেখলেন, ছেলে তার পানির গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে। মায়ের দোয়ার বরকতেই শিশু বায়জিদ

www.amarboi.org

পরিণত বয়সে আল্লাহর অলী হতে পেরেছিলেন। তাকে আমরা হযরত বায়জিদ বোস্তামী (রহঃ) নামে জানি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর নাম নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছো। শহরে নতুন চাকরিতে যোগদান করেছেন। ব্যস্ত সময় কাটছে তার। এমন সময় মায়ের চিঠি এল। মা লিখেছেন, শিগগির বাড়ি এসো। তোমার ভাইয়ের বিয়ে। মায়ের ডাকে সাড়া দিতে তিনি ছুটির জন্য দরখাস্ত করলেন। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হল না। তিনি ভাবলেন মায়ের নির্দেশ লংঘিত হতে পারে না। তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। রওনা হলেন বাড়ির উদ্দেশে। দামোদর নদীর তীরে যখন এসে পৌছলেন তখন গভীর রাত। বর্ষাকাল। নদীতে পানি থৈ থৈ করছে। তীরে আছড়ে পড়ছে বিশাল বিশাল ঢেউ। পারাপারের কোনো ব্যবস্থা নেই। খেয়াঘাটে কোনো তরীর দেখা মিলল না। তাকে ভোর হবার আগেই বাড়ি পৌছতে হবে। মা তার অপেক্ষা করছেন। বিদ্যাসাগর কাল-বিলম্ব না করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাঁতড়িয়ে নদী পার হলেন। ভেজা শরীরে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌছে ডেকে উঠলেন, মা আমি এসেছি। মাতৃভক্তির এসব দৃষ্টান্ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমাদের মনটা ভরে যায়। আমরা কি পারি না মায়ের প্রতি অধিকতর যত্নবান হতে।

মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে! নিশ্চয়ই পারি। বাবা-মায়ের আদেশ নিষেধ মেনে আমরা আমাদের জীবনের ভুল-ত্রুটিগুলো দূর করতে পারি। প্রতিটি বাবা-মা চান তার সন্তান মানুষের মতো মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক। কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন অনুপম কবিতা– "আমার মাকে"। ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'মা'। কবি আল মাহমুদ এর সারা জাগানো কবিতা নোলক। দেশ মাতৃকাকে তিনি মায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তোমরাও মাকে সম্মানিত করো। তোমাদের সৃষ্টিকর্মগুলো মাকে নিবেদন করো। গুণীজনেরা বলেন, মা ও জন্মভূমি মণি-মুক্তা অপেক্ষাও গরীয়সী।

www.amarboi.org

গুণবান মানুষ হও...

নিজেদের আদর্শের প্রতি যদি বিশ্বাস দুর্বল হয়, ভালোবাসা কমে যায়, প্রতিশ্রুতির ভিত নড়ে যায় তবে বিজাতীয় সংস্কৃতি সহজেই তাদের প্রভাবিত করে। আমরা কথা বলবো মূল্যবোধ নিয়ে।

মূল্যবোধ বলতে আমরা কি বুঝি? মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ডকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের ভালোমন্দ বিচার করা হয়। মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চাল-চলন, কার্যক্রম প্রভৃতি মূল্যবোধের অনুকরণে পরিচালিত হয়। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, চাল-চলন, কার্যাবলী, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও সিদ্ধান্তকে যে সব বিশ্বাস-আদর্শ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে মূল্যবোধ বলে। মুল্যবোধকে পরিচর্যা করে আদর্শিক বিশ্বাস বা ধর্ম। পিতা-মাতার অনুসৃত ধর্মের প্রতি শৈশবেই প্রতিটি ব্যক্তি আনুগত্য প্রদর্শন করতে শেখে। এই অনুসৃত ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে এবং তার করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়। ইসলামী জীবন বিশ্বাসে দেশপ্রেম ঈমানের অংশ। এই বিশ্বাসে যার চির ধরে সে ব্যক্তি দেশের সম্পদ ভিনদেশে পাচার করে দিতে দ্বিধা করে না। আমরা বলি ওই ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়েছে।

Albert Einstein বলেন, সফল মানুষ হওয়ার চেষ্টা করার থেকে বরং মুল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো।

সময়ের বিবর্তনে মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। এটা হয় ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতার অভাব থেকে।

www.amarboi.org

আমাদের দেশে আজ থেকে দশ বছর আগেও ইভটিজিং কথার এত প্রসার ছিলো না। এখন তা জাতীয়ভাবে প্রতিরোধের কথা ভাবা হচ্ছে। আগে নারীর সম্মান ছিলো, এখন তারা যৌতুকের বলি হচ্ছে। বিত্তবান ঘরের ছেলেরা নেশা করছে। কিশোর অপরাধ বাড়ছে। এ সবই হচ্ছে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে। যে সমাজ তার নৈতিক চরিত্র হারিয়েছে, সে সমাজ ধ্বংসের পথে চলছে। ইতিহাসের পতনই হচ্ছে নৈতিক পতন।

কেউ কেউ মনে করেন যে সততা, দায়িত্বশীলতা, ন্যায়বিচার, ওয়াদা রক্ষা করা, দেশপ্রেম– এই মূল্যবোধগুলো পুরানো হয়ে গেছে। এগুলো পুরানো, কিন্তু অপ্রচলিত নয়। এই মূল্যবোধগুলো সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং চিরকাল মানুষের সমাজে প্রচলিত থাকবে। এই মূল্যবোধগুলোর নিউইয়র্ক, নয়াদিল্লী অথবা নিউজিল্যান্ড সর্বত্রই একই অর্থ। এগুলো সর্বজনীন। ইতিহাসের এমন সময় বা সভ্যতার কথা জানা নেই যখন এই মূল্যবোধগুলোকে শ্রদ্ধা করা হয়নি। একজন মানুষ গুণবান হতে পারে, যখন সে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং ভালো কাজ করে। মূল্যবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি বলা যাবে তাকে যার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, দয়া সাহস, নৈতিকতা, সততা, সহমর্মিতা, বিনয়, আনুগত্য ভদ্রতাবোধ– এইসব গুণের সমন্বয় ঘটে।

www.amarboi.org

ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো...

চরিত্র গঠনে নৈতিক শিক্ষার উপাদানগুলোর মধ্যে ধৈর্য ও ক্ষমা অন্যতম।

ধৈর্য অর্থ সহিষ্ণুতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দৃঢ়তা, অবিচলতা। ধৈর্য মানব জীবনের একটি মহৎ গুণ। এটি মানবজীবনের সফলতার চাবিকাঠি। ধৈর্যের অনুশীলন ছাড়া ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় না। মানুষের জীবনে আসে সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, সফলতা-বিফলতা, জয়-পরাজয়। এ সব ক্ষেত্রেই ধৈর্যের প্রয়োজন।

দুনিয়ার জীবনে মানুষকে প্রতি পদে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এসব জয় করেই বেঁচে থাকতে হয়। রোগ-শোক জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন, ব্যর্থতা, গ্লানি ও হতাশা এ সবই কোনো না কোনো সময় জীবন চলার পথে এসে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বাধার কাছে যে ব্যক্তি হার মানে তার নিকট এগুলো অভিশাপ হয়ে ওঠে। সহনশীল ও ধৈর্যশীল লোক এসবের সাথে অনবরত সংগ্রাম করে; ক্ষণিক পরাজয়ের মধ্যেও শক্তি সঞ্চয় করে ক্রমশ জয়ের পথে অগ্রসর হতে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, 'দুঃখের সময় বেশি দিন স্থায়ী হয় না।' কবি অভয় দিয়েছেন, 'মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়/আড়ালে তার সূর্য হাসে।' মেঘ সাময়িকভাবে সূর্যকে ঢেকে দেয় বটে; পরক্ষণেই সূর্য সমহিমায় উদ্ভাসিত হয়। পৃথিবীকে আলোকিত করে। দুঃখ এসেও তেমনি জীবনকে ম্রিয়মান করে ক্ষণিকের জন্য। তারপরই সুখ আসে। প্রশান্তি ছড়ায়। কথায় বলে সবুরে মেওয়া ফলে।' জীবনে সফলতা ও উন্নতি লাভ করতে হলে প্রথমত যা দরকার তা হলো সহনশীলতা বা ধৈর্যধারণ। যে কোনো কাজে দৃঢ় মনে লেগে থাকাই ধৈর্যশীলতা। নিরন্তর সাধনা ছাড়া কোনো সুফল আশা করা যায় না।

www.amarboi.org

অধৈর্য ও অস্থিরচিত্ত মানুষ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অক্ষম এবং জীবনে তাকে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হয়।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে বড় হয়েছেন। কিন্তু তিনি সাহস হারাননি। হাজারো প্রতিবন্ধকতা উৎরায়ে জ্ঞান সাধনা ও অধ্যবসায় চালিয়ে গেছেন। তাই তিনি তীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছো মহান।' কবি তাই আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

ধৈর্যের তিনটি স্তর রয়েছে। অবৈধ বস্তু থেকে নিজের মনকে পবিত্র রাখতে ধৈর্য ধারণ করা। মহান সৃষ্টিকর্তার স্তুতি ও আনুগত্য প্রদর্শনে ধৈর্য ধারণ করা, ও যে কোনো বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা।

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন, ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। মহানবী (সাঃ)-এর ওপর অনেক অত্যাচার নিপীড়ন হয়েছে। কাফিররা তাকে বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করছে। তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। নবীজি (সাঃ) তাতে মোটেও ধৈর্যহারা হননি। সকল আপদে বিপদে তিনি ছিলেন অটল-অবিচল। এ কারণেই তিনি সত্যের আলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। মানুষের জীবন চলার পথ বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও যে জীবনের সুন্দরের স্বপ্নে বুক বাধতে পারে, বেঁচে থাকার জন্যে তার চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ নয়। তাই মহৎ ব্যক্তিরা বিপদে পিছপা হননি বরং ধৈর্য সহকারে এগিয়ে বিজয়ের মালা ছিনিয়ে এনেছেন।

কবির ভাষায় তোমাদের বলতে চাই–

দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কি বা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে, যদিও না চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।

ক্ষমা : ক্ষমা অর্থ মাফ করা। প্রতিশোধ না নেয়া। প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে মাফ করে দেয়ার নামই ক্ষমা। ক্ষমা করা একটি মহৎ গুণ। এটি সৎ মানুষের উত্তম বৈশিষ্ট্য। মাফ করা

www.amarboi.org

আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহর মানুষের জন্য সকল সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ মূর্খতাবশত আল্লাহর কথা ভুলে যায়। তাঁর হুকুম অমান্য করে। তাঁর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়। এরপর যখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।

মানুষ সামাজিক জীব। দৈনিন্দন জীবনে অমরা একত্রে বসবাস করি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কেউ না কেউ ভুল করতে পারে। অন্যায় করতে পারে। ভুল হলেও তাকে শাস্তি দেয়া যায় না। এতে সমস্যা আরও বাড়ে। ক্ষমা করার ফলে ভুল কমে যায়। মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে ও অনুতপ্ত হয়। যারা ক্ষমার গুণ অর্জন করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। ভুলের জন্য কাউকে ক্ষমা করলে আল্লাহও তাকে ক্ষমা করেন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন ক্ষমার আদর্শ। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) তার চিরশত্রুদের ক্ষমা করে দেন। তিনি তাদের বলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা মুক্ত, স্বাধীন।' পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এমন দৃষ্টান্ত বিরল। অপরাধীকে ক্ষমা করা হলে সে অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয়। ক্ষমাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। তোমরা নিজেদের ভুলত্রুটির জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে মাফ চাইবে এবং অপরের দোষত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তবে তোমরা মহান হয়ে উঠতে পারবে।

www.amarboi.org

সুস্থ দেহে সুন্দর মন

আমরা ভাই-বোনরা আব্বার কাছে খাওয়া শিখেছি। বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করে বলি। শিশুরা সাধারণত খাওয়া-দাওয়ার আদব, পরিবারের পিতা-মাতার কাছেই শিখে থাকে। আমরাও তাই শিখেছি। তবে আব্বা আমাদের বাড়তি যে জিনিসটি শিখিয়েছেন তা হলো কোন খাদ্যটি কেন খেতে হবে, কিভাবে খেতে হবে, কোন খাবারে কি পুষ্টিগুণ আছে, কোনটা দেহের কোন কাজে লাগে ইত্যাদি। আমরা না খেলে উনি রাগ অনুরাগও প্রকাশ করতেন। বলতেন, ছোটমাছ (মলা, ঢেলা) কাটাসুদ্ধ খাবে। এতে তোমার দাঁতে ক্ষয়রোগ হবে না, চোখের জ্যোতি বাড়বে। হাঁড়ের পুষ্টি সাধন হবে। প্রচুর সালাদ খাবে। এতে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। খাদ্য ভালোভাবে চিবিয়ে খাবে তাতে খাদ্য সহজে হজম হবে।

এখন আমরা বুঝি খাদ্য নির্বাচন ও খাওয়ার ব্যাপারে আব্বা কেন এত তাগাদা দিতেন। আব্বা চাইতেন তার ছেলে-মেয়েদের সু-স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য যে সকল সুখের মূল আব্বা তা সচেতনভাবেই অনুধাবন করতেন।

তোমরা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যসচেতন হতে চাও! হতে চাও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। তোমরা যদি একটু গভীরভাবে ভাবো– দেখবে সু-স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে জীবনের সুখ-শান্তি হাসি-আনন্দ। শরীর ভালো না থাকলে পড়ালেখায় মন বসে না। পড়াশোনার চাপ সহ্য হবে না। পরীক্ষায় রেজাল্ট খারাপ করে বসবে। কথায় বলে 'সুস্থ দেহ সুন্দর মন'। রোগাজীর্ণ জীবন ক্লান্তি অবসাদ আলস্য বিরক্তি অসহিষ্ণুতা প্রভৃতিতে ভরে ওঠে। জীবনের সাবলীল অগ্রযাত্রা তখন ব্যাহত হয়। নিজেকে যোগ্য করে গড়ার পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। আনন্দময় জীবন উপভোগ এবং জ্ঞানের চর্চার

www.amarboi.org

জন্যেও প্রয়োজন সুন্দর স্বাস্থ্য। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে বা যত্নবান হওয়া যায় সু-স্বাস্থ্যের জন্য। সে বিষয়েই কিছু কথা বলা যাক কেমন!

রোগাক্রান্ত হবার কারণঃ

মানুষ দুভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেঃ (এক) প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে একটা নিয়ম শৃঙ্খলা বিরাজমান। মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়ম ক্রমাগতভাবে ভঙ্গ করতে থাকে তখন সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যেমন ধরো, সূর্যোদয়ের সময় সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি জেগে ওঠে। তখন যদি তোমরা কেউ ঘুমিয়ে থাকো তবে তা অসুস্থতার কারণ হতে পারে। দুপুরে খাবারের পর সামান্য বিশ্রাম করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আবার রাতে খেয়ে সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়া শরীরে জন্য ক্ষতিকর। এ নিয়মগুলো অবজ্ঞা করলে স্বাস্থ্যহানি ঘটাই স্বাভাবিক। অনেকে আছর নামাযের পরও ঘুমায়। এ সময় ঘুমালে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়।

(দুই) আমাদের চারপাশে প্রকৃতিতে কোটি কোটি সূক্ষ্ম জীবাণু (ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া) ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ সবের অধিকাংশ মানুষের উপকারে আসলেও শতাধিক জীবাণু মানুষের জন্য হুমকিস্বরূপ। আমরা সচেতন না হলে যে কোনো সময় এসব জীবাণু আমাদের আক্রমণ করতে পারে। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে ভালোভাবে হাতমুখ ধুয়ে নেয়া উচিত। খাবার আগে হাত ধুয়ে নাও। খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখো। বাসি খাবার খাবে না। বিশুদ্ধ পানি খাবে। এসব সতর্কতা অবলম্বন করলে জীবাণু আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াও ঃ

রোগ চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো স্বাস্থ্যের জন্য সুখকর। এ জন্য (এক) পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার খাও। প্রচুর সালাদ ও মওসুমী ফলমূল খাবে। (দুই), মাঝে মধ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাও। তোমার দেহে যে জিনিসের ঘাটতি আছে তা দৈনিন্দন খাবার তালিকায় নিয়ে আসো। ডাক্তারের পরামর্শ কাজে লাগাও।

অসুখ হলে চিকিৎসা নিতে অবহেলা করো না। (তিন) প্রচুর পানি খাও। সকালে ঘুম থেকে উঠে পানি খাওয়ার অভ্যাস করো। পানি খেলে কিডনি

www.amarboi.org

ভালো থাকে। শরীর চর্চা করো। (চার) বিকেলে খেলাধুলা ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জণ্য খুব উপকারী। নিয়মিত শরীর চর্চা করলে দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া সচল থাকে। (পাঁচ). লেখাপড়া ও কাজের পর বিশ্রাম প্রয়োজন। একটানা কাজের পর দেহে ক্লান্তি নেমে আসে। তাই জীবনে নতুন কর্মশক্তি ফিরে পাবার জন্য বিশ্রাম নিতে হয়। স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ঠিক রাখতে পরিশ্রমের পর বিশ্রাম চাই। আল্লাহ তায়ালা রাতকে বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

নির্দোষ আমোদ : জীবনে একঘেয়েমী কাটানোর জন্য বিনোদন চাই। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নাও। ভ্রমণ করো। টিভিতে ভালো অনুষ্ঠান উপভোগ করো। বন্ধু-বান্ধব মিলে গঠনমূলক আড্ডা দাও। আনন্দের খোরাক পাবে। আমোদ-প্রমোদ, হাঁসি-খুশি থাকতে পারা সু-স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ।

আলস্য বড় ব্যাধি ঃ আলসতা আমাদের সমাজ ও দেশের জন্য মারাত্মক একটি রোগ। শারীরিক ও মানসিক অবসাদ বিকারগ্রস্ততা এবং বিভিন্ন জরা ব্যাধির আধার আলস্য। আলস্য মানুষের সম্ভাবনা শক্তিতে নিঃশেষিত করে দেয়। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অলসতা থেকে আল্লাহ'র কাছে আশ্রয় ছেয়েছেন। তাই এসো সু-স্বাস্থ্যের জন্য, সম্ভাবনাময় জীবনের জন্য অলসতাকে ঝেড়ে ফেলি। স্বাস্থ্যসচেতন হই। সুন্দর জীবন গড়ি।

www.amarboi.org

এ উচ্চারণ হতে হবে তোমারও

শহরের বড় রাস্তার মোড়ে বিশাল বিলবোর্ডে একদল কিশোর-কিশোরীর উচ্ছল উচ্ছ্বাস– আমরা ধূমপান করি না! হয়তো দেখে থাকবে। এ উচ্চারণ হতে হবে তোমারও।

একদিনের কথা বলি। ফজরের নামায পড়ে হাঁটতে বেরিয়েছি। বসন্তকাল। ভোরের ফুরফুরে হাওয়া। প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। বুকভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। অক্সিজেনের আমেজ টের পাওয়া যায়। হঠাৎ একটা উটকো গন্ধ নাকে এসে ঢুকলো। বাধা দিতে পারলাম না। সামনে তাকাতে দেখি ভদ্রগোছের একজন সিগারেট ফুঁকছে। তিনিও হাঁটতে বেরিয়েছেন। কি অর্থহীন তার Morning Walk! আমি অগ্রসর হয়ে তাকে সালাম দিয়ে বললাম, 'যদি ধরেও নেই ধূমপান আপনার অধিকার। কিন্তু আপনি প্রকৃতির নির্মল বাতাস দূষিত করছেন। আপনার ফুসফুস থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া আমাকে গেলাতে বাধ্য করছেন। এটা নিশ্চয়ই আপনা অধিকার নয়?' ভদ্রলোক মাথা নোয়ালেন। বললেন, অভ্যাসটা খুব খারাপ। ছাড়ার চেষ্টা করছি।

আমাদের দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। নারী পুরুষ বিশেষ করে উঠতি যুবক যুবতীরা মরণ নেশায় আসক্ত হচ্ছে। এবং জীবনকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। কোনো দেশের যুব সম্প্রদায়ের মাদকাসক্ত হবার অর্থ হচেছ সে দেশের মানুষের নৈতিক চরিত্রের দেউলিয়াপনা ও অধঃপতন অনিবার্য। একটি দেশের যুবসমাজ সবচেয়ে বড় সম্পদ। একে মানবসম্পদ বলে। বড় দেশ তথা দুনিয়ার পরাশক্তিগুলো উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর যুবশক্তিকে পদানত করে বাগে রাখতে চায়। চায় তাদের পণ্যবাজারে পরিণত করতে। এ জন্য তারা মাদকের ন্যায়

www.amarboi.org

মারাত্মক সব বস্তু চোরাপথে আমাদের দেশে ঢুকিয়ে দেয়। এ কাজে সহায়তা দেয় আমাদের দেশেরই সমাজবিরোধী একশ্রেণীর লোক। তাদের দুর্বৃত্ত বলাই শ্রেয়। এ ব্যাপারে আমাদের যুবসমাজকে সচেতন হতে হবে। প্রখ্যাত বিষ বিজ্ঞানী ফিওদর উগলভ বলেছেন, 'মাদকের নেশা মানবজাতির জন্য যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের একান্ত প্রতিক্রিয়ার চেয়েও ভয়াবহ।'

মাদকাসক্তের হাতেখড়ি হয় ধূমপানের মাধ্যমে। একখণ্ড পরিচ্ছন্ন কাগজে মোড়া সিগারেট আকর্ষণীয় হলেও আসলে তা উগ্র নিকোটিনের বিষে ভরা। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, নিকোটিন এত মারাত্মক যে, দুটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন আছে, তা ইনজেকশন দিয়ে কোনো সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে তার মৃত্যু অনিবার্য। প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবনে সীনা বলেছেন, 'পৃথিবীর এত ধূলি ধোঁয়া ও গ্যাস যদি মানুষের ফুসফুসে না ঢুকতো, তাহলে মানুষ হাজার বছর ধরে সুস্থ অবস্থায় জীবিত থাকতো।' ধূমপান যক্ষ্মা ব্রঙ্কাইটিস দন্তক্ষয় ক্ষুধামন্দা, গ্যাস্টিক আলসার, ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের জন্ম দেয়। সিগারেট শুধু নিজে জ্বলে না, অন্যদের জ্বালায়। ধূমপান শুধু ধূমপায়ীর জন্যই বিপজ্জনক নয়, তার আশপাশের অধূমপায়ীদের জন্যও বিপজ্জনক। ধূমপায়ীর ঘরে অধূমপায়ী নারী শিশু ও বৃদ্ধা থাকলেও তারাও সমানভাবে নিঃশ্বাসের সাথে ধূমবিষ গ্রহণ করে। তাই বলা হয়, ধূমপান মানে বিষ পান। ধূমপান বিষপানের চেয়েও ভয়াবহ। কারণ বিষ পানে শুধু বিষপানকারীই ক্ষতি হয়। আর ধূমপানে তার পরিবেশ অধূমপায়ী এমন কি ভবিষ্যৎ বংশধরেরও মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের ধূমপান অপরাধ। ধূমপান অনর্থক অপব্যয়। ইসলাম সব রকম অপব্যয় অপচয় বর্জন করতে বলে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খায়, সে যেন (ঐ অবস্থায়) মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।'

এবার এর প্রতিকার নিয়ে ভাবা যাক।

সৎসঙ্গ: অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন তরুণ একজন যুবক বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে, কথা রাখতে গিয়ে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ধূমপানের

www.amarboi.org

জন্য সঙ্গদোষ বিশেষভাবে দায়ী। মানুষ সামাজিক জীব। জন্মগতভাবে সঙ্গপ্রিয় মানুষের জীবনে সৎসঙ্গ যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রাখে, তেমনি অসৎসঙ্গ তার ব্যক্তিত্ব প্রতিভা সুনাম এমনকি সাফল্যকেও ধ্বংস করে দেয়। তাই জীবনের সুন্দর বিকাশের জন্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সৎসঙ্গ বেছে নিতে হবে। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রঃ) বলেছেন, 'মন্দ কাজের চেয়ে মন্দ লোকের সঙ্গ অধিকতর মন্দ।'

ইচ্ছাশক্তি : ধূমপান বর্জনের জন্য ব্যক্তির দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি (Will Force) কাজে লাগাতে হবে। মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টার। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, Where there is a will, there is a way.

শিক্ষা ও মূল্যবোধ : ইসলামের শিক্ষা ও বিধি বিধান পুরোপুরি মেনে চললে ধূমপান বর্জন করা সহজ হয়। নিজের এবং পরিবারের একান্ত আপনজন ছেলে-মেয়ে স্ত্রী ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার সুস্বাস্থ্যের কথা ভেবে ধূমপান বর্জন করতে হবে।

আইনের প্রতি শ্রদ্ধা : জাতীয় সংসদে ধূমপানবিরোধী আইন পাস হয়েছে। যানবাহন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও লোকসমাগমস্থলে ধূমপান নিষিদ্ধ করে জরিমানার বিধান করা হয়েছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে ধূমপান বর্জন করা উচিত।

তোমরা পারো–

* নিজে ধূমপান থেকে বিরত থাকো।
* ড্রয়িংরুমে ছাইদানী রাখবে না। ধূমপান মুক্ত বোঝানোর জন্য স্টিকার বা সাইন লাগিয়ে রাখো।
* শালীনতার সাথে অতিথিকে বাড়িতে ধূমপান না করার জন্য বলো।
* ধূমপান না করার জন্য বন্ধুদের উদ্বুদ্ধ ও প্রশংসা করো।
* ধূমপানবিরোধী প্রচারণা ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ কর।
* শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় No Smoke বিষয়টি তুলে ধরো।

এভাবে আমরা ধূমপানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারি এবং জীবন সমাজ ও সংসারকে বাঁচাতে পারি।

www.amarboi.org

শিশুদের ঘিরে প্রকৃতি পরিবেশের উপাত্তই তাঁর লেখার উপজীব্য। তার লেখায় শিক্ষণীয় দিকটিও ফুটে ওঠে। তার ভাষা সাবলীল। শিশু মননের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, শব্দ চয়ন এবং শব্দ সাশ্রয় তার লেখায় গতি এনেছে।

তার লেখা প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ঝরা পাতার গান', 'ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে', 'শিশুদের প্রতি রাসূল (সা.) এর ভালোবাসা', 'ছোটদের লেখালেখি ও সাংবাদিকতা', 'গ্রামীন সংবাদ ও সাংবাদিকতা' উল্লেখযোগ্য।

আহসান হাবিব বুলবুল বাংলা একাডেমীর একজন সদস্য।

ডিজাইন মোঃ আব্দুল লতিফ

www.amarboi.org

আহসান হাবিব বুলবুল পেশায় একজন সাংবাদিক। তবে মননশীল লেখক ও শিশু সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি বেশি পরিচিত।

তিনি ১৯৬২ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানা সদরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আহম্মদ হোসেন ছিলেন পুলিশের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। মাতা দৌলতন নেছা একজন গৃহিনী।

আহসান হাবিব বুলবুল এর শিক্ষা জীবন শুরু হয় উল্লাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। তিনি ট্যালেন্টপুলে প্রাইমারী বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে উল্লাপাড়া পাইলট বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন উল্লাপাড়া সরকারী আকবর আলী কলেজ থেকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৭ সালে উল্লাপাড়া জমিদার বাড়ীর জনাব আমির হোসেন আরজু মিয়ার একমাত্র কন্যা লায়লা আরজুমান বানু'র সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের এক কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে।

তিনি স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখি শুরু করেন। ছোটদের নিয়েই বেশি লেখেন। শিশু-কিশোরদের বিচিত্র ভাবনা, কৌতুহল ও চাওয়া-পাওয়া এসব নিয়েই তিনি তাঁর গল্পের কথামালা সাজান।

www.amarboi.org

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম